রবিবারের বৈঠক

যুগশঙ্খ SUPPLI

রবিবার, ২৯ এপ্রিল ২০১৮

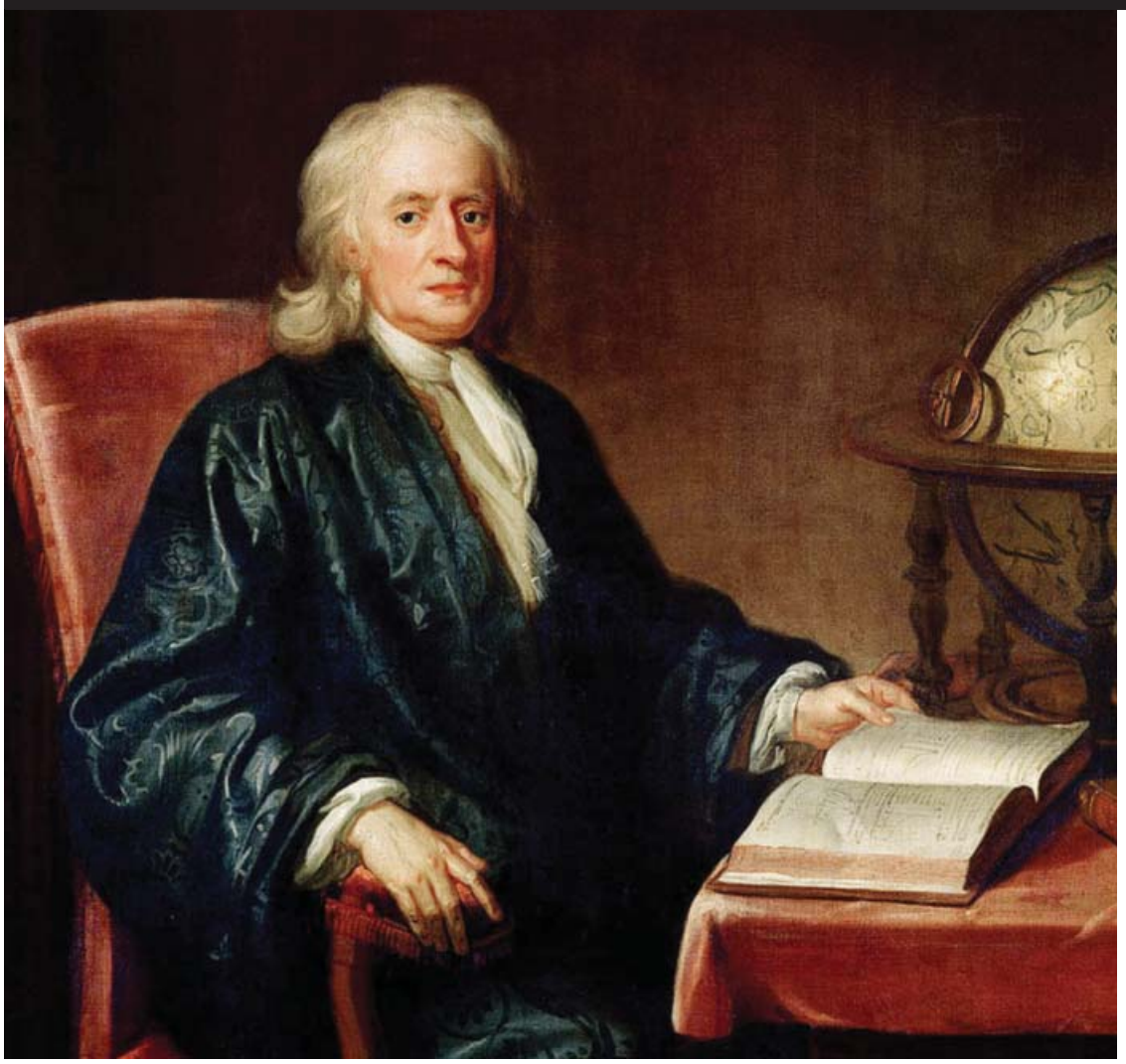

বিতর্কিত নিউটন

অচিন্ত্যকুমার মাইতি

'বিশ্বের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উদ্ভূত'— স্বামী বিবেকানন্দের এই শাশ্বত উক্তি বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শৈশব থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। নিষ্পেষণকারী দারিদ্র্য, জীবনে চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবুও তাঁর ভিতরে আবির্ভূত হল- না হেরে যাওয়ার এক অদম্য শক্তি, যে শক্তি তাঁকে আইজ্যাক নিউটন থেকে মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন করে তুলল। জীবনে বহুবার তিনি বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়েছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে সেই বিতর্কগুলি স্বীয় যুক্তিতে খণ্ডন করে তিনি নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রেখেছিলেন। তাই তো তিনি আমাদের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে দুই যুগপুরুষ আইজ্যাক নিউটন ও রবার্ট হুকের দীর্ঘকালের বিতর্ক এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এক সময় হুক বিখ্যাত বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েলের সংস্পর্শে আসেন। এখান থেকে শুরু হয় হুকের বিজ্ঞান গবেষণায় সাফল্য। হুক বহু সময়ে বিজ্ঞানীমহলে নিজেকে আলোক-বিজ্ঞান সম্পর্কে একজন পণ্ডিত হিসাবে প্রতিপন্ন করতেন। নিউটনের সঙ্গে হুকের বিতর্কের সূত্রপাত হল নিউটন যেদিন প্রথম রয়াল সোসাইটিতে আলো ও বর্ণালি-সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাপত্র পাঠ করেন। নিউটন দাবি করেছিলেন যে, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি এই আবিষ্কার করেছিলেন।

১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ। এক রবিবারের অপরাহ্নে নিউটন ও জন উইকিন্স দুই বন্ধু মিলে কেমব্রিজের কাছেই মেলা দেখতে যান। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে একটি খেলনার দোকানে বিভিন্ন রং-এর খেলনার মধ্যে একটির প্রতি নিউটনের নজর পড়ল। বস্তুটি ছিল একটি ত্রিকোণ কাচখণ্ড বা প্রিজম। প্রিজমটির সৌন্দর্য ও ধারগুলির মসৃণতা দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। বস্তুটি কিনে ছাত্রাবাসে এসে সেটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ঘরের একটি জানালা ছাড়া অপর জানালাগুলি পর্দা টেনে ঢেকে দিলেন। একটি কার্ডবোর্ডে ছোট্ট ফুটো করে, যে-জানালার পর্দা টানা হয়নি তার সামনে এমনভাবে রাখলেন যাতে বাইরের উজ্জ্বল আলো ফুটোর মধ্য দিয়ে এসে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে সরু ছিদ্র দিয়ে যে আলোকরশ্মিগুচ্ছ প্রবেশ করল তা নিয়ে নিরীক্ষণ করতে শুরু করে দিলেন। তিনি প্রিজমটিকে আলোকরশ্মিগুচ্ছের সামনে ধরলেন যাতে আলোকরশ্মি প্রিজমের একপাশ দিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। দেখা গেল প্রিজম থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি নির্গত হয়ে পিছনের সাদা দেওয়ালে এসে পড়ল। প্রিজমে যে সাদা আলো এসে পড়ে তা প্রতিসরণের পর সাতটি রং-এ বিশ্লিষ্ট হল এবং সাতটি রং হল— বেগুনি, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও সাদা। সাদা দেওয়ালের উপর আপতিত রশ্মিগুলি রামধনুর মতো দেখতে। নিউটন এই ঘটনার নামকরণ করেন বর্ণালি বা স্পেকট্রাম। নিউটন লক্ষ করলেন যে, দৃশ্যমান আলো, যার সাহায্যে আমরা বিশ্বকে দেখতে পাই, তা প্রকৃতপক্ষে রামধনুর সমস্ত রংয়ের সংমিশ্রিত রূপ অর্থাৎ সাদা আলো প্রিজম দ্বারা সাত রং-এ বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালির সৃষ্টি করে। এই সাত রং নিয়ে তিনি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেলেন। তিনি দশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের আড়াআড়িভাবে কার্ডবোর্ড দিয়ে একটি গোলক তৈরি করলেন। গোলকটি সাতটি ভাগে ভাগ করলেন। ভাগগুলি ঠিক রামধনুর সাতটি রংয়ের ভাগ অনুযায়ী করা হয়েছে। রামধনুতে রংগুলি যে যে অবস্থানে আছে তেমনভাবে গোলকের ভাগগুলিতে রং করলেন। এরপর গোলকটিকে একটি চাকতির উপর বসালেন। তিনি চাকতিটিকে সজোরে ঘোরাতে থাকলেন এবং দূর থেকে গোলকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি অবাক হয়ে গেলেন, দেখলেন সব রং একাকার হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র সাদা রং দেখা যাচ্ছে। তিনি ছাত্রাবস্থায় তাঁর আবিষ্কারের সবকিছু তথ্য অত্যন্ত নিপুণভাবে লিখে রাখলেন। তাঁর আবিষ্কার তখন তিনি বিজ্ঞানীমহলে প্রচার করলেন না। বহুদিন পরে তিনি আবিষ্কারের সব তথ্য সর্বপ্রথম রয়াল সোসাইটির এক সভায় প্রকাশ করলেন। আলোক-বিজ্ঞানের এক নতুন দ্বার খুলে গেল— নাম হল 'বর্ণালি বিজ্ঞান' বা স্পেকট্রোস্কপি (Spectroscopy)। এটিই হল নিউটনের বর্ণালিতত্ত্বের সৃষ্টির ইতিহাস।

নিউটন যেদিন রয়াল সোসাইটির সভায় আলো ও বর্ণালি-বিষয়ক গবেষণাপত্রটি পাঠ করছিলেন, সেদিন রবার্ট হুক উপস্থিত ছিলেন। হুক নিউটনের বক্তব্য শুনে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, 'নিউটন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রিজম ও আলোর যে-সব তত্ত্ব পরিবেশন করলেন, সেগুলি অনেক আগেই করেছি। সোসাইটির বিভিন্ন সভায় প্রিজম নিয়ে নানা পরীক্ষা ও তার ফল অনেকবার দেখিয়েছি। এতে নিউটনের কোনও কৃতিত্ব নেই, সব কৃতিত্বটা আমার।' সেদিন থেকেই নিউটনের সঙ্গে হুকের বিবাদ শুরু হল। হুকের বিরোধিতার ফলে নিউটন এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, হুক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি আলো সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থ প্রকাশের দিন অর্থাৎ ১৬৮৬-এর ২৮ এপ্রিল রাত থেকেই হুক, নিউটনের বিরোধিতা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি বিজ্ঞানীমহলে জানিয়েদিলেন যে, নিউটন তাঁর অভিকর্ষতত্ত্বকে নিজের বলে চালিয়েছেন। একমাত্র তিনিই অভিকর্ষের ব্যস্তানুপাতী বর্গমূলের স্রষ্টা। আসল ব্যাপারটি হল নিউটনের অভিকর্ষতত্ত্বের আগে গ্রহগুলির কক্ষপথ কেন উপবৃত্তাকার— এ নিয়ে অনেকের মনে সংশয় ছিল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যে দুটি বস্তুর দূরত্বের ব্যস্তানুপতিক, এই তথ্যটি অনেকেই জানতেন। কিন্তু হুক দাবি করে বসলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মূল সূত্রটি তাঁরই এবং এই আবিষ্কারের কথা 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে তাঁর নামে উল্লেখ করতে হবে। নিউটন বাদ সাধলেন। নিউটন রয়াল সোসাইটির সভাপতিকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি এই দাবি মেনে নিতে রাজি নন। কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মূল সূত্রটি পূর্বসূরিরা অনেকেই জানতেন। কিন্তু গ্রহগুলির কক্ষপথ যে উপবৃত্তাকার হবে তা কেউ দেখাতে পারেননি। একমাত্র নিউটনই সেটি গণিতের সাহায্যে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন। নিউটন একসময় বলেছিলেন, 'If I have been farther than others, it is by standing on shoulders of giants'। অর্থাৎ 'আমি যদি অন্যান্যদের চেয়ে কিছুটা বেশি দেখতে সমর্থ হয়ে থাকি, সেটি সম্ভবপর হয়েছে বিরাট প্রতিভাবান মানুষদের স্কন্ধে আরোহণ করে।'

অনেকের ধারণা উক্তিটি হুকের উদ্দেশে ব্যঙ্গ করে বলা, কারণ হুক ছোটখাটো আকৃতির মানুষ ছিলেন। হুকের সে-সময় এমনই হাবভাব ছিল যে, নিউটন যা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি অনেক আগেই যেন তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন— এমন কথা বিজ্ঞানীমহলে হুক প্রচার করতেন। প্রায় পাঁচ বছর ধরে কেমব্রিজে নিউটন আর লন্ডনে হুকের মধ্যে তীব্র কটূক্তি করে পত্রাঘাতের পর পত্রাঘাত চলে। নিউটন তখন রয়াল সোসাইটির সচিবকে চিঠি দিয়ে সবকিছু জানালেন। তিনি চিঠিতে লিখলেন, 'হুক আসলে কোনও কিছুই করেননি, কিন্তু সকলের কাছে এমন ভাব দেখান যে, তিনি সবকিছুই জানতেন।' তিনি চিঠিতে আরও জানালেন, 'এতকিছু ঘটনার পর আমার পক্ষে রয়াল সোসাইটির ফেলো পদে থাকা আর সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনি দয়া করে ওই পদ থেকে অব্যাহতি দিন।' রয়াল সোসাইটির অন্যতম প্রবীণ সদস্য বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল তখনও জীবিত। তাঁর তত্ত্বাবধানে ব্যাপারটি আর এগিয়ে যেতে পারেনি। রয়াল সোসাইটিতে বয়েলের বিশাল প্রতিপত্তি ছিল। বয়েল নিউটনের গবেষণাপত্রগুলি এবং প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থ খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিউটনের বিজ্ঞানসত্তাকে যথেষ্ট সম্মান জানাতেন। রয়াল সোসাইটির সভাপতিকে

এরপর পরের পাতায়

অন্য পাতায়: প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, স্পেশাল কলাম, আত্মজীবনী, ধারাবাহিক উপন্যাস, গ্রন্থ সমালোচনা, রাশিফল

যুগশঙ্খ
SUPPLI
রবিবার, ২৯ এপ্রিল ২০১৮

বিতর্কিত নিউটন

আগের পাতার পর

লেখা নিউটনের চিঠি নিয়ে বয়েল সকল সদস্যর সঙ্গে বসলেন। নিউটনের চিঠি পড়ে সদস্যরা দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সভায় একজন অনড় ও নির্বিকার হয়ে রইলেন— তিনি হলেন রবার্ট হুক। বয়েল নিউটনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সওয়াল করলেন, সেই সময় হুকের যুক্তি বা আপত্তি কোনও কিছুই ধোপে টিকল না। অবশেষে সোসাইটির সকল সদস্যের পীড়াপীড়িতে নিউটন তাঁর ফেলো পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন। হুক যখন দেখলেন যে, বিশ্বের বিখ্যাত বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটনকে সমর্থন করছেন, হুক তখন দমে গেলেন। তখনকার মতো ব্যাপারটি মিটে গেলেও উভয়েই মন থেকে ঘটনাটি মুছে ফেলতে পারেননি। শেষ ক'বছর হুক খুব মনযন্ত্রণায় ভুগেছিলেন।

পরবর্তীকালে নিউটন আবার একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি হলেন জার্মান বিজ্ঞানী গটফ্রিড উইলহেল্ম লিবনিজ। তিনি ১৬৮৪ সালে ক্যালকুলাসের উপর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এর ২০ বছর আগে ১৩ নভেম্বর, ১৬৬৫ সালে নিউটন 'Method of Fluxions' নামে ক্যালকুলাসের উপর একটি গবেষণাপত্র লেখেন। নিউটন তখন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র। এই পদ্ধতির সাহায্যে তিনি বক্ররেখার কোনও কোনও বিন্দুতে স্পর্শক ও বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে সমর্থ হন। লিবনিজ দাবি করে বসলেন যে, তিনিই ক্যালকুলাসের প্রবক্তা। সেসময় বিজ্ঞানীমহলের কেউ কেউ বলতেন যে, উভয়েই ক্যালকুসারের উপর নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু ক্যালকুলাসের প্রকৃত আবিষ্কর্তা কে, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। যে সময়ে বিতর্ক দানা বাধঁল, তখন নিউটনের খ্যাতি তুঙ্গে— বিশ্বের একজন সফল বিজ্ঞানী এবং সর্বপ্রথম 'নাইট' উপাধিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী। নিউটন প্রচার করলেন যে, তাঁর পূর্বের প্রকাশিত ক্যালকুলাসের উপর কাজগুলি অনুকরণ করে লিবনিজ ক্যালকুলাসের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের এক অংশ স্বীকার করেছেন যে, লিবনিজের ক্যালকুলাসের উপর কাজগুলি মৌলিক। লিবনিজ ১৬৭৩ সালে এই আবিষ্কারের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন যে, নিউটন রয়াল সোসাইটির সভাপতি থাকাকালীন তাঁর নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে সকল সদস্যকে হাত করে নিয়েছিলেন। তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে সকল সদস্য একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, ক্যাকুলাসের প্রকৃত আবিষ্কর্তা নিউটন। এত বড় অসত্য রটনাকে কোনও মতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি লিবনিজ। তাঁর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দাখিল করেছিলেন, কিন্তু ধোপে টিকল না। এই চূড়ান্ত অবমাননা নিয়ে ১৭১৬ সালে লিবনিজ মারা গেলেন। সেদিন সারা জার্মানির একজন লোকও এই মহান বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসেননি।

বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইজেন সংক্ষেপে হাইজেন-এর সঙ্গে নিউটন আরও একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। হাইজেন নিউটনের চেয়ে ১৩ বছরের বড়। হাইজেনের আলো ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাগুলি পরবর্তীকালে নিউটনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ও পদার্থবিদ্যার নানা গবেষণার পিছনে রয়েছে হাইজেনের অবদান। প্রিজমের উপর আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে নিউটন ও হাইজেন উভয়ে একই সময়ে গবেষণা করেন, কিন্তু আলোকতত্ত্ব নিয়ে উভয়ের মতামত হল একেবারে ভিন্ন। নিউটন বললেন যে, সূর্যের আলো সাত রংয়ে ভেঙে যায়, আর হাইজেন বললেন যে, আলো জলতরঙ্গের মতো ঢেউ খেলে যায়। নিউটনের সমর্থনকারীরা হাইজেনের মতবাদকে সমর্থন করলেন না। তখন বিজ্ঞানীমহলে আলো তরঙ্গ না কণা এই- বিতর্ক তুঙ্গে। এই সুযোগে হাইজেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিউটনের আলোকতত্ত্বের বিরোধিতা করে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন। এহেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর আচরণে নিউটন খুব ব্যথিত হয়েছিলেন।

জীবনে এতবার বিতর্কে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ভবিষ্যতে আর কোনও গবেষণাপত্র প্রকাশ করবেন না। এখন থেকে গবেষণার মূল্যবান ফসল তুলে রাখবেন ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের জন্য। তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় লিবনিজকে লেখা একটি চিঠি থেকে—

'প্রিয় লিবনিজ,

আমার আলোকতত্ত্বের গবেষণা বার হতে না-হতেই আমি এত বেশি আলোচনার শিকার হলাম যে, মনে মনে নিজের অদূরদর্শিতাকে দোষ না দিয়ে পারলাম না। সেই অদূরদর্শিতা, যা আমার স্বাভাবিক চেপে রাখার স্বভাবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে একদিন ছায়ার পিছনে ছুটেছিল।'

নিউটন তাঁর আবিষ্কার নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ুন না কেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর যুগোত্তীর্ণ বিজ্ঞান প্রতিভা, বিস্ময়কর আবিষ্কার ১৭ শতকের বিজ্ঞানকে এক নতুন পথের নিশানা দেখিয়েছিল, যে- পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীর দল।

আ লো চ না

বাংলায় নাজাফি বংশীয় নবাবদের অবদান

ফারুক আব্দুল্লাহ

পলাশির যুদ্ধের পর বাংলায় শুরু হয় নাজাফি বংশের শাসন। এই বংশের প্রথম নবাব হিসাবে বাংলার মসনদে বসেন নবাব মীর মোহাম্মদ জাফর আলি খান। এই মীরজাফরকেই সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্র, পলাশির যুদ্ধ, নবাব সিরাজের নির্মম হত্যা, পলাশি- পরবর্তী বাংলার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা ইংরেজদের প্রাধান্য বৃদ্ধির জন্য এককভাবে দায়ী করা হয়। ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের খলনায়ক হিসাবে আজও তাঁকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে স্মরণ করা হয়। এখনও বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ হিসাবে মীরজাফরের নামটি বার বার ফিরে আসে।

মীরজাফর নবাব হয়েছিলেন বটে কিন্তু নবাবি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তিনি ভোগ করতে পারেননি। তাঁকে বহু অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর জীবদ্দশাতেই ১৭৬৫ সালে বাংলা সুবার দেওয়ানি ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে নবাবের অর্ধেক ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। স্থির হয় নবাব শুধু প্রশাসন দেখবে এবং তাঁর বেতনও দেবে ইংরেজরা। অথচ নবাব মুর্শিদকুলি খান থেকে নবাব সিরাজ পর্যন্ত নবাবরা উভয় ক্ষমতাই ভোগ করতেন। নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা নামমাত্র মসনদে বসতে থাকেন বংশ পরম্পরায়। এদিকে যত দিন যায় কোম্পানি সরকার ধীরে ধীরে নবাবদের সুযোগ-সুবিধা ও তাঁদের বার্ষিক আয় কমাতে থাকে। নবাবরা ক্রমশ ইংরেজদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এইভাবেই একদিন নাজাফি বংশের নবাব ফেরাদুন-এর আমলে নাজাফি বংশের শেষ সম্মান হিসাবে বাংলা, বিহার, ওড়িশার নবাব নাজিম উপাধিটুকুও বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। একদা বাংলা-বিহার-ওড়িশার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাবরা পরিণত হলেন শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরে। নাজাফি বংশের বিশেষ করে মীরজাফর-পরবর্তী নবাবদের বিরুদ্ধে রয়েছে বহু অভিযোগ। কিন্তু বহু অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নাজাফি বংশের নবাবদের অবদানকেও অস্বীকার করা যায় না।

এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, বর্তমানে মুর্শিদাবাদের যা কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে তার অধিকাংশই মীরজাফর বংশীয় (নাজাফি বংশ) নবাবদের কীর্তি। নাজাফি বংশীয় এই নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী শহর মুর্শিদাবাদ পরিণত হয়েছিল সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম কেন্দ্রে। এই বংশের নবাবদের অধিকাংশই ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। এমনকী নবাব আলি স্বয়ং ভালো গায়ক ছিলেন। সেই সময় প্রচুর সংগীতজ্ঞ এবং বাদক নবাবদের সহানুভূতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। নবাব ফেরাদুন জা গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে সংগীতের জন্য 'ধ্রুপদ বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেছিলেন। এছাড়া সেই সময়ের মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত বাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রতনচাঁদ স্বামী, যিনি নবাব ফেরাদুন জা-র 'দরবারি বাদক' ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন আতা হসেন খাঁ, যিনি ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার আসরে তবলা বাজিয়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন। নবাবি পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এবং সমগ্র ঊনবিংশ শতক জুড়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতে মুর্শিদাবাদের গৌরব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু সংগীতজ্ঞরাই নন, চিত্রকর এবং কবিরাও নবাবদের সহানুভূতি লাভ করেছিলেন। কথিত রয়েছে, তৎকালীন সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের উর্দু এবং ফারসি কবিদের মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। শোনা যায় যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের খ্যাতনামা উর্দু কবি মির্জা গালিবও নাকি নবাব নাজিমের অতিথি হয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন।

তৎকালীন সময়ে মুর্শিদাবাদের কিছু উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন হায়ব আলি খাঁন, সৈয়দ ইনসাআল্লাহ খাঁন ইনসা, মীর মোহম্মদ হায়াত, হারদেরাম জুদাত প্রমুখ। চিত্রশিল্পেও গড়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র 'মুর্শিদাবাদী ঘরানা'। মুর্শিদাবাদী ঘরানায় শুধু মুঘলরীতিই নয়, লক্ষ্ণৌ এবং রাজস্থান রীতিও অনুসরণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে বহু ব্রিটিশ চিত্রকর মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন এবং তাঁরা মুর্শিদাবাদের চিত্রশিল্পকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। এখনও মুর্শিদাবাদের চিত্রকলার বহু নিদর্শন হাজারদুয়ারী প্রাসাদে দেখতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও নবাবদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব হুমায়ুন জা-র আমলে ও মীরজাফরের পত্নী মুন্নি বেগমের দানের অর্থে স্থাপিত হয় মুর্শিদাবাদ নিজামাত মাদ্রাসা ও নিজামাত কলেজ। পরবর্তীতে নিজামত কলেজটি বন্ধ হয়ে যায় এবং মাদ্রাসাটি নবাব বাহাদুর স্কুলে পরিণত হয়। এই স্কুলটি এখনও মুর্শিদাবাদের অন্যতম নামী স্কুল হিসাবে পরিচিত। বাংলার নবাবরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করে এসেছেন। নবাবরা মন্দির নির্মাণের জন্য প্রচুর জমি দান করেছেন। আজও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে মসজিদের পাশেই মন্দিরের অবস্থান দেখা যায় যা নবাবদের উদারতারই পরিচয় দেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসেফ আলি মির্জা ছিলেন সদাজাগ্রত সৈনিক। স্বাধীনতার পর মুর্শিদাবাদের ভারত ভুক্তির ক্ষেত্রেও নবাব ওয়াসেফ মির্জা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বর্তমানে বাংলার নবাবদের বংশধররা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ সহ ইউরোপের নানান প্রান্তে বসবাস করছে। মুর্শিদাবাদেও নবাব বংশের প্রায় ১০০টির বেশি পরিবার বসবাস করছে। আজ নবাব কিংবা নবাবি কিছুই নেই। তবুও নবাব পরিবারের মানুষ তাদের নবাবি আদব-কায়দা ধরে রাখার বিষয়ে বদ্ধ পরিকর। আজ তাদের মুখে পূর্বের নবাবি ভাষা ফারসির বদলে এসেছে উর্দু। নবাবি খানাপিনার আয়োজন এখন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠান উপলক্ষেই হয়ে থাকে। তবুও বেরা উৎসব, নাওরোজ ও মহরমের মতো অনুষ্ঠানগুলি আজও মুর্শিদাবাদের নিজামত পরিবারগুলি পালন করে আসছে। বেরা ও মহরম উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ শহরে মেলা বসে। এই দুই অনুষ্ঠানেই ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করে।

পলাশির যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মীরজাফর এবং তার বংশধরগণের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ তথা সমগ্র বাংলার জনগণের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ রয়েছে। কিন্তু এই অসন্তোষ মেনে নিয়েও একই কথা স্বীকার করতেই হয় যে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের শিল্প-সংস্কৃতির অগ্রগতিতে নাজাফি বংশের নবাবদের বিরাট অবদান ছিল। ব্রিটিশের অধীন ভারতে মুর্শিদাবাদের পূর্ব গৌরব কিছুটা হলেও যে মীরজাফর বংশীয় নবাবরাই ধরে রেখেছিলেন সে কথা বলাই যায়।

রবিবারের বৈঠক

যুগশঙ্খ
SUPPLI
রবিবার, ২৯ এপ্রিল ২০১৮

ব্যক্তিত্ব

লিটল নোবেল জয়ী ইকো কাদোনো

শিবানী দাস

জাপানি লেখিকা ইকো কাদোনোর লেখা ছোট্ট জাদুকরী ও তার সঙ্গী কালো বেড়ালের গল্প ‘কিকিস ডেলিভারি সার্ভিস’ যুগ যুগ ধরে জাপান সহ বিভিন্ন দেশের শিশু পাঠকদের তৃষ্ণা মিটিয়ে আসছে। তিনি বরাবরই জনপ্রিয় একজন শিশুসাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত। এবার ১৯৮৫ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রকাশ পাওয়া ‘কিকিস ডেলিভারি সার্ভিস’ এবং ‘গ্র্যান্ডপা’স স্যুপ’ নামের দুটি গল্প এই সাহিত্যিককে এনে দিয়েছে সর্বোচ্চ পদক। ১৭৬ পৃষ্ঠার বইটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি।

চলতি বছর মার্চ মাসের ২৬ তারিখ এই লেখিকা ২০১৮ সালের হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ইন্টারন্যাশনাল বোর্ড অন বুকস ফর ইয়ং পিপল এই পদক প্রদান করে। অনেক সময় এই পদককে সাহিত্যের লিটল নোবেল পুরস্কার বলেও গণ্য করা হয়। পুরস্কারটি সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আইবিবিআই দ্বারা লেখক ও চিত্রশিল্পীদের প্রদান করা হয়, যাঁরা অনেক বছর ধরে শিশুসাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি জাপানের একজন সক্রিয় লেখক হিসাবে পরিচিত।

৮৩ বছর বয়সি এই লেখিকা পুরস্কারের বিষয়ে বলেন, তিনি কোনওদিন চিন্তাও করেননি এ-পুরস্কার পাবেন। এটা তাঁর কাছে সত্যিই সম্মানের। পুরো পৃথিবীর অনেক মানুষ এটি পড়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, এই গল্প তাঁর নয়, বরং পাঠকদের। পুরস্কার-সংক্রান্ত জুরির চেয়ারম্যান প্যাট্রিসিয়া আলাদানা বলেন, ‘কাদোনোর বইগুলো সর্বদা বিস্ময়কর, আকর্ষক এবং ক্ষমতায়নশীল।’

১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারি এই লেখিকা জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাত্র ১০ বছর বয়সে তাঁকে নিজের বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। তখন তাঁকে জাপানের উত্তরাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে যুদ্ধশেষে জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। ডিগ্রি পাশ করার পর ২৫ বছর বয়সে ব্রাজিলে দু-বছরের জন্য থাকতে হয়েছিল তাঁকে। সালটা ছিল ১৯৬০।

যুদ্ধের সময়কার ও ব্রাজিলের দিনগুলো নিয়ে তাঁর অনেক বই রয়েছে। বইগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ‘ফরেস্ট অব টানেল’ ও ‘ব্রাজিল অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড লুইজিনহো’। ‘ব্রাজিল অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড লুইজিনহো’ নামক বইটি ব্রাজিলে থাকাকালীন তিনি লিখেছিলেন। ১৯৭০ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। তারপর তাঁর কলম থামেনি। এরই মধ্যে ছবির বই সহ একে একে মোট ২০০টি মৌলিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। রয়েছে তরুণদের জন্য গল্প, রচনা এবং প্রবন্ধ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর বিখ্যাত কাজ ‘কিকিস ডেলেভারি সার্ভিস’।

বিখ্যাত পরিচালক হায়রো মিয়াজাকি ‘কিকিস ডেলেভারি সার্ভিস’ বইটি নিয়ে ১৯৮৯ সালে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। তিনি জাপানের অ্যানিমেশন হাউস স্টুডিও ঘিবলির বিখ্যাত পরিচালক। শুধু তাই নয়, ছয় ভল্যুমে সমৃদ্ধ বইটি কেবল জাপানে নয়, বিদেশেও বহুল প্রশংসিত হয়েছে।

‘কিকিস ডেলেভারি সার্ভিস- বইটি লেখার পেছনে ইকো কাদোনোর অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে তাঁর ছোট মেয়ের আঁকা এক ছবি। তাঁর মেয়ে ছোট্ট এক জাদুকরীর ছবি এঁকেছিলেন, যে ছোটবেলায় সুরে সুরে ঘুরে বেড়াতেন। গল্পটি লেখার প্রসঙ্গে লেখিকা বলেন, তিনি যখন গল্পটি লেখা শুরু করেন, তখন তাঁর মেয়ের যে বয়স ছিল, তা মাথায় রেখে কিকিকেও ওই বয়সি চরিত্র তৈরি করেন শৈশব আর বড় হওয়ার মাঝামাঝি সময়টায়।

অন্যদিকে কাদোনোর সম্পাদক তোমোকো হোনোবে মন্তব্য করেন, ‘কিকিস ডেলেভারি সার্ভিস’ শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। শিশুরা বিশ্বাস করে, প্রত্যেকের মধ্যে নিজস্ব কিছু জাদুর ক্ষমতা আছে।’

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই লেখিকা জানান, তিনি একজন লেখকের চেয়ে বেশি করে একজন পাঠক ছিলেন। পরে বারকয়েক চেষ্টার পর অনুধাবন করেন যে, তিনি লিখতে পছন্দ করেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত না হলেও তিনি সারাজীবন লিখে যেতে ইচ্ছুক। লেখিকা নিজেকে ‘দেরিতে প্রস্ফুটিত’ বলেও উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, তাঁর যখন ৩৫ বছর বয়স, তখন প্রথম বই প্রকাশিত হয়।

তাঁর বেশিরভাগ কবিতা বা উপন্যাস শুধু মজার ছবিতেই পরিপূর্ণ নয়, সবসময় জীবন সমর্পিত। কাদোনো সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ভ্রমণ করেছেন বলেই হয়তো-বা তাঁর লেখনীর ভাবগুলো সুন্দরের পাশাপাশি সহজ ভাষা পাঠকদের অত্যন্ত পাঠযোগ্য করে তুলেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হচ্ছে- ‘লাস্ট রান’, ‘হিরো অ্যান্ড দ্য টাইগারবেড’, ‘টেলস অব এন ওল্ড সি ক্যাপ্টেন’, ‘থ্যাংক ইউ, ডক্টর বিয়ার’। আইবিবিআই’-এর ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে আগামী আগস্ট মাসে এথেন্সে এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। কাদোনোর ভাষ্যে, ‘আমার দৃঢ় অনুভূতি ছিল যে, আমি সহকর্মী হতে চাই, তাই আমি এখন সত্যিই খুশি।’

পূর্ব ভারত ও
উত্তর-পূর্ব ভারতের
সকল পাঠকই পাঠাতে
পারেন অপ্রকাশিত গল্প।
গল্প পাঠাবেন সর্বাধিক
১২০০ শব্দের মধ্যে
ইউনিকোডে টাইপ করে।

আড়াল থেকে

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

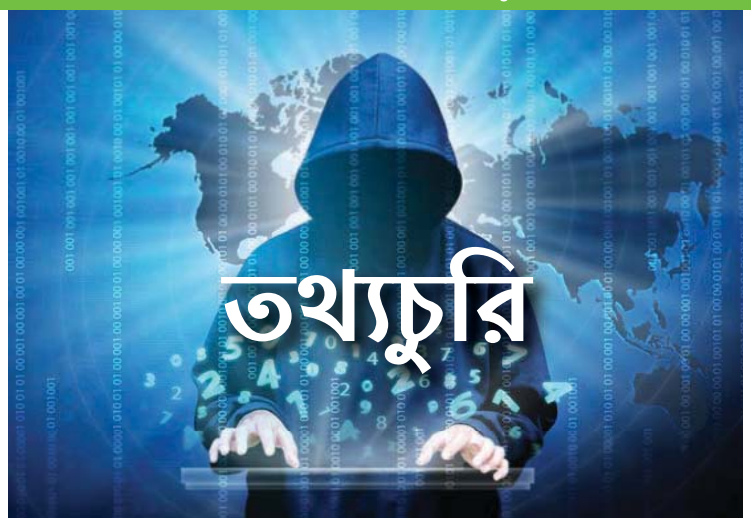

গেল গেল রব উঠল। সব ডেটা নাকি উধাও। ফেসবুক থেকে সব তথ্য নাকি চুরি হচ্ছে। এমনকী অ্যান্ড্রয়েড ফোনে লোকেশন অন করলেও গুগল আমাদের সব গতিবিধি জেনে যাচ্ছে। জি-মেইল-এর প্রত্যেকটি ই-মেইলের অ্যালগরিদম নাকি ওরা পড়ে। আর সেই বুঝে আমাকে অ্যাড দেখায়। হোয়াটসঅ্যাপের প্রত্যেকটি মেসেজ নাকি ফেসবুক কর্তাদের রেকর্ডে থাকে। কী জ্বালা রে বাবা! অথচ আমরা এখন প্রত্যেকেই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের দলদাস। আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা। তাই বলে আমার একান্ত আপন জীবনপঞ্জিতে নাক গলানোর কে হে তুমি? কোথাকার হরিদাস পাল যে আমার সবকিছু ডেটা তোমার নখদর্পণে রাখাটা জরুরি? সেদিন এই নিয়ে একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট-এর পোস্টটা মনে রাখার মতো। if you are not paying for the product then you are the product আর তাই বুঝি এইসব ফ্রি সার্ভিস। যা কিছু ফ্রি তাই সস্তার। কথায় বলে সস্তার তিন অবস্থা। তাই বলে আলাপচারিতার তথ্যও সস্তা। হ্যাঁ, ওদের মারফৎ তথ্য যখন অবাধে বিকোচ্ছে তখন সস্তা তো বটেই। যত্তসব ধান্দাবাজের কারবারি। ফ্রি-তে পাওয়া বলেই এত বাড়বাড়ন্ত ওদের। অতএব যখনি ফ্রি কোনও পরিষেবা পাচ্ছ, তখনই কেয়ারফুল। আমাকে কেন সে দিচ্ছে এই পরিষেবা? নিশ্চয়ই বিনিময়ে আমাকে ইউজ করছে। আমাকে মানে আমার প্রোফাইল সম্বলিত ডেটাকে বা তথ্যপঞ্জিকে।

হঠাৎ সেদিন ঘুম ভেঙে গেল মাঝরাত্তিরে। চোর ঢুকেছে। রাতবিরেতে চোর ঢুকলে চিৎকার করে সিকিউরিটি ডেকে, থানায় ফোন করে কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে পারি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছি গুগল, ট্যুইটার, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ-এ আমার ডেটাবেস থেকে আমার ডেটাগুলো নিয়ে ওরা কী সব করছে। শুধু আমার নয়। সকলেরই এই প্রোবলেম। ইউজারদের তথ্য ভাণ্ডারে উঁকি দিচ্ছে ওরা প্রতিনিয়ত। শুধু উঁকি নয়। রীতিমতো হানা দিয়ে তথ্য চুরি করে বিজনেস অ্যানালিসিস করাই ওদের কাজ। ডেটা পরখ করেন এইসব ডেটা অ্যানালিস্টরা। কী করেন ডেটা পরখ করে? মেঘের মধ্যে বসে আছি আমি আর আমার সোশ্যাল নেটের বন্ধুবান্ধবরা। আড্ডা জমে উঠেছে। কেউ ব্লগ লিখছিলাম মনের সুখে। কেউ ই-মেইল পাঠাচ্ছি দরকারে। কেউ ফেসবুক অলিন্দে কমেন্টের ফোয়ারা ছোটাচ্ছি। কেউ হোয়াটসঅ্যাপে গুলতানি। আর ডেটা সায়েন্টিস্টরা আমাদের আড্ডা মহলের প্রলোভন দেখানোর সুযোগে সব ডেটা মাইনিং করে ফেলছে। আসলে এটাই তাদের রুজি রোজগার। থই থই ডেটা চাই তাদের।

আমরা কি তবে এদের হাতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে?

এইসব ছাইপাস ভাবছিলাম আর ঘন নীল মেঘ সমুদ্রে বোঝাই করছিলাম তথ্য। কেউ কবিতা, কেউ গল্প, ভ্রমণবেত্তান্ত, কেউ রাজনীতির কূটকচালি আর ছবি। তথ্য-প্রযুক্তির ভাষায় একেই কয় ক্লাউড কম্পিউটিং। নিজের মেশিনে ডেটা না বোঝাই করে মেঘের মধ্যে মানে ডিজিটাল মেঘ সমুদ্রে থরে থরে ভরে দাও তথ্য। দরকার মতো ঘাড় ধরে মেঘের মধ্যে ঢুকে বের করে নাও তোমার ডেটা। সবই তো ক্লাউড কম্পিউটিং। ওরা জানছে। আর সেইজন্যেই তো আমাকে টার্গেট করে সুতীক্ষ্ণ বিজ্ঞাপন দেখিয়ে প্রভাবিত করছে। ক্লিক করলেই রেভিনিউ পাচ্ছে। ব্যবসার প্রোটোকল। ধরুন, আমি একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের পোশাক পছন্দ করি। ফেসবুকে ঢুকলেই তাদের রংচঙে সেই বিজ্ঞাপনে ক্লিক করি। আর সেই সুযোগ নেয় ওরা। যতবার আমি ফেসবুকে ঢুকি সেই বিজ্ঞাপন ওরা আমাকে দেখাতে বাধ্য। ই-কমার্সের সুযোগ নেব কি নেব না সেটা অন্য কথা। জিনিসটি কিনলে লাভ সেই কোম্পানির। কিন্তু এক ক্লিকেই তথ্যপ্রযুক্তির কৌশল আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ প্রযুক্ত হল আমার ওপর। এআই-এর চোখ ঘুরছে অহোরাত্র। ফেসবুক ইউজারের ক্লিক ক্লিক মানেই তাদের ফেসবুক থেকে রেভিনিউয়ের ঝুড়ি উপচে ওঠা। এই তো সুযোগ মুরগি করার।

‘আসলে ব্যবসার জাল পাতা যন্ত্রজালে, কখন কে ধরা পড়ে তলে তলে’ এর সঙ্গে রয়েছে রগরগে প্রলোভনে পা দেবার তথ্যচক্র। তোমার প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম বন্ধু কে, মানের ক্রমানুসারে উঠে আসবে মাত্র একটি ক্লিকে। তুমি যাকে যত বেশি মেসেজ করো সে প্রিয়তম হতে বাধ্য। যার ছবি বা স্টেটাস আপডেটে নিয়মিত কমেন্ট কর সে প্রিয়তর আর যার পোস্ট কেবল বুঝে বা না বুঝে লাইক মেরে পালাও সে থাকছেই প্রিয়র তালিকায়। জানো কি?

আরও আছে। তুমি কোন বলিউড সুন্দরীর মতো দেখতে অথবা কোন সেলিব্রিটিকে তোমার সবচেয়ে পছন্দ, শচীন না সৌরভ এসব জানতে চেয়েও ফাঁদে ফেলা যায়। একটাই উদ্দেশ্য কাজের ফাঁকে মুঠোফোনের এক ক্লিকে ফেসবুক বা গুগল আইডি দিয়ে লগ ইন, দেন স্টার্ট (ওদের কাছে তোমার ডেটা পৌঁছচ্ছে কিন্তু)। আর তারপর বিন্দাস! উতল হাওয়া। ঝলমল করে উঠল চিত্ত। উত্তর দেখে চমকিত আমি ও তুমি। আর মাঝখান থেকে ওদের ডেটা কালেকশন আর তারপর মাইনিং বা হান্টিং যাই বলো।

মেঘের কোলে বসে ভাবছিলাম আবারও। তবে কে আমি? বা আমার মতো নগণ্যের এহেন ডেটাবেস? হাতে স্মার্ট ফোন, কোলে ল্যাপটপ, ব্লগ লিখছি আমি। হাত নিশপিশ ক্লিকের জন্য। কিন্তু আর নয়। ক্লাউডে ভাসছে সব ডেটা। ওরা খুঁড়ে ফেলছে ডেটার খনি। ফেসবুকের নীল স্ক্রিনে আমার চোখ। মেঘের আড়াল থেকে বিভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন না? আমিও তাই করি? নক্ষত্রপুঞ্জ ধেয়ে আসছে আমার দিকে। মহাস্থবির গ্রহেরা হাঁ করে গিলছে আমাকে। সতর্কবাণী তাদের- বুঝেসুঝে চলো হে! কেয়ারফুল! তাই বলে কেয়ারলেস নয় কিন্তু’

আমি কি তবে চুরি হয়ে গেলাম? ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে দেখি ধুস্! আমার মতো নগণ্য পাবলিকের গোলাপ না পলাশ কি প্রিয় জানতে চেয়ে প্রশ্নবাণ আবারও ধেয়ে আসছে আমার দিকে। আমি এড়িয়ে যাই এবার। কারণ কয়েক বছর আগেই নীল রং না লাল রং সেটা সাধারণ লোকেদের কাছে জানতে চেয়েই ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিপন্ন হয়েছিল। সে ডেটা হান্টিং ছিল নীল পার্টি না লাল পার্টির পক্ষে না বিপক্ষে জানার কৌশল। আর তলে তলে আমেরিকার ভোটযুদ্ধে ফেসবুক ইউজারদের রাজনৈতিক প্রেম কোন দলে সেই তথ্যটুকুনি ওরা কাজে লাগিয়ে নিল সুকৌশলে। অর্থাৎ ভোটদাতারা প্রভাবিত হল এভাবেই। বিজ্ঞাপনের দ্বারা। এবার বুঝুন আপনি কী করবেন।

কথায় কথায়

এখনকার শিশু সাহিত্যিকরা কি শিশু-মনোস্তত্ত্বকে মাথায় রেখে শিশু সাহিত্য রচনা করেন?

আশিস ভট্টাচার্য
শিশু সাহিত্যিক

এখন যাঁরা শিশু সাহিত্য চর্চা করছেন তাঁরা অনেকেই শিশু মনস্তত্ত্বের কথা মাথায় রাখেন না। তাঁরা তাঁদের লেখাকে আরও চটকদার এবং আকর্ষণীয় করতে গিয়ে লেখার মধ্যে এমন কিছু নিয়ে আসছেন যার ফলে শিশুদের মনের মধ্যে একটা নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট পড়ছে। আগেকার দিনে মা-ঠাকুমার মুখ থেকে শিশুরা যে-গল্প শুনত তাতে গাছ, পাতা, ফুল পাখি ইত্যাদি থাকত। এই সব গল্পে ওদের সুকোমল মনের বিকাশ ঘটে– এমন মেসেজ থাকত। এগুলো ছোটদের গল্পের মতো করেই লেখা হতো, যাতে তাদের পড়তে ভালো লাগে। যাতে ওদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি হয়। শিশুর আদর্শ, চরিত্র তৈরি করবার, নিজের মানসিকতা বাড়াবার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। আসলে শিশুদের মনটা তো খুব নরম। তাই প্রথম থেকে তাদের মনের মধ্যে যদি সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোর চেতনে জাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা ভালোভাবে বিকশিত হতে পারে। আবার গল্পের মধ্যে দিয়ে যা কিছু ওদের না জানা জিনিস, যা কিছু ওদের শিক্ষণীয় জিনিস সেগুলো দিতে হবে।

কিন্তু এখন যাঁরা শিশুসাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন, তাঁদের বেশিরভাগই শিশুদের মনোস্তত্ত্ব মানছেন না। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি নিয়ে লিখছে এবং সেগুলোকে জোর করেই এক রকম শিশু সাহিত্য বলে চালানো হচ্ছে। এগুলো মোটেই ভালো ব্যাপার নয়। আমি যেমন একটা গল্প লিখেছিলাম, সেই গল্পটার বিষয় ছিল টুনটুনির প্রতি রাগে রাজা টুনটুনিকে গিলে ফেলছে। তাই একজন তরবারি দিয়ে এক কোপ মেরেছে। সেই তরবারির কোপে রাজার নাক কেটে গেছে। আমি সেখানে কাটা নাকের বদলে ব্যান্ডেড করা নাক দেখিয়েছিলাম। কারণ শিশু মনোস্তত্ত্ব বলে, শিশু সাহিত্যে এমন কিছু লেখা যাবে না যা শিশুদের মনের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। তবে হ্যাঁ, তাকে কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ সেটা চেনাতে হবে। যেমন রূপকথার গল্পের মধ্যে প্রায়ই চলে আসে রাজকুমার রাক্ষসকে মারতে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে গেল। গিয়ে তাকে বধ করল। এটার মানে শিশুদেরকে গল্পের মাধ্যমে এটা বলা যে খারাপের কখনও জয় হতে পারে না। রূপকথার এই গল্পগুলোর মধ্যে যে-মেসেজটা আছে তা হল সততার জয়গান। শিশুদের সবসময় খুব ডার্ক কোনও বিষয় বা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির নীচতা থেকে দূরে রাখা উচিত। তবে অনেকেই আছে যারা হানা-হানি, কাটা-কাটি, মারা-মারি নিয়ে লিখছেন। এর ফলে বাচ্চাদের মনের ওপর প্রভাব পড়ছে।

তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে। এক শ্রেণির সাহিত্যিক আছে যারা শুধু শিশুদের জন্য লেখে তারা নিজের মতো করে লেখালিখি করে। আর এক শ্রেণির সাহিত্যিক আছে যারা ফরমাইশি লেখেন। এতে প্রকাশক তার বই বিক্রি বাড়ানোর জন্য ঠিক যেমন যেমন বলে লেখকও তাই তাই লেখেন। এতে বইয়ের বক্রি বাড়ে বটে তবে তার প্রভাবও আমরা দেখতে পাই। এই যে আমেরিকাতে একটা ১৪-১৫ বছরের ছেলে বন্দুক নিয়ে স্কুলের কতগুলো বাচ্চাকে মেরে দিল এটা তো একটা নেগেটিভ এফেক্ট। এর পিছনে আছে হয়তো কোনও বন্দুকবাজের গল্প। তার অব্যর্থ নিশানা-র কথা পড়ে কোথাও ইনস্পায়ার্ড হচ্ছে বাচ্চারা।

মতামত জানাতে পারেন আপনিও। ইউনিকোডে লিখে মেল করুন jugasankha.suppli@gmail.com আইডিতে কিংবা ডাকে পাঠান এই ঠিকানায়: ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯।

ফিরে দেখা

সেদিনের কালবোশেখি, অব্যর্থ ঢিল, কাঁচা আম আর কৃষ্ণচূড়া

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখের কিছু আবদার থাকে। চিরকাল পূরণ হয়ে এসেছে সেই আবদার। একটু কালবোশেখি, কয়েকটি অব্যর্থ ঢিল- যেগুলি কাঁচা আমের থোকার দিকে ছুটে যাবে সবার চোখ এড়িয়ে। আর কৃষ্ণচূড়া। আলো-ছায়ার কাটাকুটি খেলায় যখন উৎসাহ দেয় ঝলসে দেওয়া দুপুরের রোদ, ঝুম মেরে থাকে চারপাশের প্রকৃতি, অজানা আশংকায় গাছে গাছে কথা চালাচালি হয় ফিসফিস, তখন তাদের ডালপালায় লেগে থাকা আলতো বিষণ্নতা জেনে যায় পিপাসার্ত পাখপাখালি। দুপুরের ভাত-ঘুম লেগে থাকা চোখে গৃহস্থও বুঝে নিতে চায় ঘোরলাগা আকাশের মনোভাব। হঠাৎই দমকা বাতাস, শনশন আওয়াজ। উষ্ণ স্তব্ধতাকে ফালাফালা করে দিয়ে ছুটে আসে হাওয়ার প্রবল ঢেউ। চঞ্চল হয়ে ওঠে গাছেরা। কেঁপে ওঠে টিনের চাল, দড়াম আওয়াজে বন্ধ হয়ে যায় খিড়কির দরজা। ধুলোয় ঢেকে যায় চরাচর। উন্মত্ত ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে আসা কালবৈশাখী লণ্ডভণ্ড করে দেয় সামনে যা পায়। তখনই ভর্তি দুপুরেও নেমে আসে অন্ধকার। কবি মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায়, ‘দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণিবন্ধন সন্ধ্যার।’

দুপুর বা বিকেলের গোড়াতেই সন্ধ্যার অন্ধকার নিয়ে আসা, আচম্বিতে কিছুটা তছনছ করে দিয়ে আবার শান্ত স্নিগ্ধ রোদ ঝলমল বিকেল ফিরিয়ে দেওয়া, যেন কিছুই হয়নি, অভিজ্ঞজনেরা জানেন, এটাই ছিল বৈশাখের অতি প্রিয় আবদার। কিন্তু কালবৈশাখীর সে দিন গেছে। হয়তো সেও জেনে গেছে এখন বিশ্বায়নের যুগে তার এভাবে তোলপাড় করা আচরণ শোভা পায় না। সবাই সব খবর রাখে পৃথিবীর কোন প্রান্তে কখন কী ঘটে যাচ্ছে। কোথায় স্নো ফলে স্কিড করে যাচ্ছে রাস্তার গাড়ি, কোথায় কেমিক্যাল অ্যাটাকে শেষ হয়ে যাচ্ছে জীবন। এ সময় দিনে-দুপুরে অন্ধকার নিয়ে এসে ধ্বংসলীলা চালিয়ে আবার ধুলো কালি ধোওয়া উজ্জ্বল বিকেল এনে দেওয়ার ম্যাজিক্যাল রোম্যান্টিসিজম চলে না। অত সময় নেই কারও হাতে। ধ্বংস এখন ধ্বংসই, তার কোনও সৃষ্টির দায় নেই, সৌন্দর্যের ধারণা নেই। তাই কালবৈশাখীর সেই রূপও আজ আর নেই। সে এখনও আসে, তবে চলে যাওয়া বিকেল বা সন্ধ্যায়, রীতিমতো ফোরকাস্ট দিয়ে।

অথচ কালবৈশাখী একসময় ছিল যেন বাঙালির জীবনের অংশ। চৈত্র থেকে পুড়ে যেতে থাকা মাটি, শুকিয়ে যেতে থাকা গাছপালা আর গরম হতে থাকা বাতাস একযোগে মানুষকে জানিয়ে দিত তারা কী চায়। তুলকালাম করা ঝড়, চোখ ঝলসে দেওয়া বিদ্যুৎ, আর ভয়ংকর মেঘের গর্জন। যেন ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু নিমেষেই। ভেঙে পড়ত ঝড় সামলে নেওয়া বড় গাছগুলিরও কিছু ডাল। উড়ে যেত বেশ কিছু ঘরের চালা। শহরের কোনও বাড়িতে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ত জানলার কাচ। সর্বনাশা ঝড় আর বৃষ্টির সঙ্গে ঘনঘন চমকে দেওয়া বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ঝলকানি ঘরের মধ্য আটকে রাখত আদ্যোপান্ত বাহিরমুখী মানুষকেও। কিছুক্ষণ ধ্বংসলীলা চালিয়ে যখন থেমে যেত ঝড়বৃষ্টি, আবার কালো মেঘ সরিয়ে সূর্য ভেসে উঠত আকাশে, প্রকৃতি যেন স্নান করে হেসে উঠত তখন। গ্রামের রাস্তা দিয়ে বয়ে যেত বৃষ্টির জল। অতি যত্নে আর ভালোবাসায় বোনা বাবুই পাখির কয়েকটি বাসাও পড়ে থাকত গাছ থেকে ছিঁড়ে। আর থাকত চারপাশ জুড়ে একটা সোঁদা গন্ধ, একটা স্বস্তি আর শান্তির নিশ্চয়তা।

এছাড়াও বৈশাখের নিঝুম দুপুর ডেকে নিত কিছু ডানপিটে শিশু-কিশোরকে। ভূতে মারবে ঢিল এই ভয়কে অগ্রাহ্য করে তারা নিজেরাই ঢিল সংগ্রহ করে বড়দের চোখ এড়িয়ে চলে যেত রাস্তায় ঝুঁকে পড়া কোনও আমগাছের নীচে, অথবা বাগানে। হাতের অব্যর্থ ঢিল অথবা লাঠির একটা টুকরোর মতো ছোট্ট কিছু যা পাওয়া যেত তাই ছুঁড়ে দিত কাঁচা আমের থোকায়। নিশ্চিত পড়ে যেত কয়েকটি আম। তারপর কজনে মিলে সে এক অদ্ভুত আনন্দের উদ্‌যাপন।

আর কৃষ্ণচূড়া? বৈশাখ মানেই তো অঢেল কৃষ্ণচূড়ায় আকাশ রঙিন। নীলের ক্যানভাসে দিগন্তে যেন আগুন জ্বলে। সামনে রবীন্দ্রজয়ন্তী। কৃষ্ণচূড়া ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। তাই প্রকৃতি আগে থেকেই সাজিয়ে রাখে সম্ভার। সেই কৃষ্ণচূড়া ফুল নিয়ে শিশু-কিশোরদের একটি খেলা বৈশাখের দুপুরের আর এক অনুষঙ্গ। ঠিক ফুল নয়, ফুলের ঠিক মাঝখানে যে একটি দণ্ড থাকে সেইটি নিয়ে। তার একেবারে ডগায় একটি আঁকশি। দুজনের মধ্যে যার হাতের আঁকশি অন্যের আঁকশিটিকে ছিঁড়ে দিতে পারবে, সেই জিতবে। খুব মামুলি, কিন্তু আনন্দের কিছু কম পড়তো না।

কালবৈশাখী এখনও আছে, সেই রূপ আর নেই। এখন আর বৈশাখে সে ঘন ঘন নিয়ম করে দুপুরেই সন্ধ্যাকে নামিয়ে নিয়ে আসে না। ক্লাইমেট চেঞ্জ বা প্রকৃতির খামখেয়ালিতে পড়ে সে এখন অনিয়মিত আর শান্ত হয়ে গেছে অনেকটা। শিশু-কিশোরদের এখন আর ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়তে যাবার সময়ও নেই, উপায়ও নেই। উন্মুক্ত আমের বাগানও নেই। আর কৃষ্ণচূড়া অবহেলায় পড়ে থাকে গাছের নীচে, রাস্তায়, বাগানে। সেই ফুল নিয়ে খেলার কথা কোনও শিশু ভাবতেই পারে না।

সাহিত্য সংবাদ

আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮০তম জন্ম বর্ষপূর্তিকে স্মরণে রেখে বৃহত্তর নৈহাটি অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ‘বঙ্কিম মানস প্রবাহ’ নামে একটি সংগঠন। এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানটি হবে ভাটপাড়া অমরকৃষ্ণ পাঠশালায়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এই দিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দে মহাশয়। এরপরেই থাকবে মাঙ্গলিক সংগীত। সংগীত পরিবেশনা করবেন সাহানা চট্টোপাধ্যায় ও গার্গী ভাদুড়ী। স্বাগত ভাষণ দেবেন ড: অলোক চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দেবেন, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক পবিত্র সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সাহিত্যিক বাণী বসু।

সাহিত্য সংস্কৃতি কৃষ্টি পরিষদের পক্ষ থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘বঙ্কিমের জন্মস্থান নৈহাটি। তাই বৃহত্তর নৈহাটি অঞ্চলে বঙ্কিম সাহিত্য এবং বঙ্কিমের যে জিনিসগুলো মানুষ ভুলতে বসেছে সেগুলোর চর্চার জন্য এছাড়াও বঙ্কিমী আমলের গানের মাধ্যমে কৃষ্টিটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।’

ছো ট গ ল্প

জলছবি

মানস সরকার

ভিড় ঠেলে যতটা সম্ভব দ্রুত এগোনোর চেষ্টা। উলটো দিক থেকে আসা মানুষের স্রোত মাঝে মধ্যেই অসহায় করে দিচ্ছিল তুহিনকে। তবুও প্রাণপনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। প্রথমে ভেবেছিল, আসবে না।

কাল বিকেলেই অনুজার সঙ্গে দেখা করেছিল দেশপ্রিয় পার্কের একটা রেস্টুরেন্টে। প্রায় মিনিট পাঁচেক চুপ থেকে প্রথম মুখ খুলেছিল অনুজাই, টিকিট কনফার্মড। কালকেই বেড়িয়ে যাচ্ছি।

তুহিন জানত, দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে অনুজার চান্স পাওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ওর মতো মেয়ের দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজিতে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশন করা উচিত। প্রেসিডেন্সি থেকে এ-বছরেই রেকর্ড মার্কস নিয়ে ইংরেজিতে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে অনুজা। স্কটিশ চার্চ-এর ফিজিক্স অনার্সের মার্কসে তুহিন অনুজার ধারেকাছে নেই। তাই ওর মতো মেয়ের সামনে নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখে।

তারপর ঠোঁট কামড়ে একটু অভিযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করেছিল অনুজা, 'আর তুমি তো যথারীতি অত ভিড়ের মাঝখানে আসবে না?'

দু'বছরের সম্পর্কে অনুজাকেই বেশি স্বপ্রতিভ লাগে। সকলের সামনে গিয়ে প্রেমিকার হাত ধরা বা কোনও রকম ন্যাকামোর কথাবার্তা বলা এমনিতেই তুহিনের আসে না। কিন্তু দিল্লি যাওয়ার খবরটায় সত্যি মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই নিরালা পরিবেশেও কথাটা বোধহয় মুখ ফুটে বলতে পারবে না তুহিন। একটু শুকনো হেসে প্রশ্ন ফিরিয়ে দিল, 'প্যাকিং হয়ে গেছে?'

—তাতে তোমার কী! না হলে, আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি করে দিয়ে আসবে? জ্বলে উঠেছিল অনুজা।

—ওখানে গিয়ে তুমি কার সঙ্গে এইভাবে ঝগড়া করবে, একটু দুষ্টু হওয়ার চেষ্টা করেছিল তুহিন।

মাথা নিচু করে নিয়েছিল অনুজা। শেষ কথাটা অল্প হলেও যেন এই স্মার্ট মেয়েটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

অনেক সকালে ঘুম ভাঙলেও বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিল তুহিন। অনুজা চলে যাচ্ছে অথচ একবারও হাওড়ায় যাবে না! পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, অনুজার বাড়ির লোক কেউ থাকতে পারে। বাড়ি থেকে স্বীকৃতি না দিলেও সম্পর্কটা যে চালিয়ে যাবে, এ রকম একটা আভাস অনুজা দিয়েছিল। তাহলে যেতে আর আপত্তি কোথায়! অন্তত পক্ষে দুটো বছর কোনওভাবেই ওদের আর নিয়মিত দেখা হওয়া সম্ভব নয়....

বেশ কিছুটা দূর থেকেই অনুজাকে চিনে নিল তুহিনের চোখ। রাজধানী এক্সপ্রেসে যাওয়ার কথা। ট্রেনের কামরার দরজায় ঠেস দিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছে অনুজা। ডেনিম জিন্স, সাদা টপ আর পিঠের ল্যাপটপ ব্যাগে আকর্ষণটা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে অনুজার। দু'এক পা করে হেঁটেও ট্রেনের কামরার দরজার কাছটায় যেন কিছুতেই আর পৌঁছতে পারছিল না তুহিন।

চোখ পড়েছে অনুজার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, সে চোখে বিস্ময় আর আনন্দের মিলমিশ। দূর থেকেই একটু শুকনো হাসি ছুঁড়ল তুহিন।

কথাবার্তা বন্ধ রেখে প্ল্যাটফর্মে হাঁটতে থাকে অনুজা। অজানা ভঙ্গিমা। কী বলবে, তৈরি হচ্ছিল তুহিন। মুখ খোলার আগেই ওকে জড়িয়ে ধরল। হতবাক তুহিন। চিবুকের কাছে থাকা মাথা থেকে উঠে আসা সদ্য শ্যাম্পুর পবিত্র গন্ধ। পুরোপুরি অবশ অনুভূতি। স্পর্শে নীরব আবেগ। শব্দের নড়াচড়া নেই। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা, ট্রেনের ভেতরে থাকা অনেক চোখই এখন ওদের দু'জনের ওপর।

এবার সবার থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে গভীর আবেশে ও জড়িয়ে ধরল অনুজাকে।

—এভাবে সম্ভব নয়। বিকল্প ব্যবস্থা তোমাকে দেখতেই হবে।

ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলল না তুহিন। ঘুমনো না অবধি এইভাবেই নিজের শ্বশুড়-শাশুড়িকে নিয়ে অভিযোগ জানাতে থাকবে অনুজা। বিয়ে হওয়ার তিনমাসের মধ্যে যে মতান্তর শুরু হয়েছে তা প্রায় ভয়ংকর রূপ নিয়েছে বিবাহিত জীবনের তৃতীয় বছরে। প্রথম প্রথম তুহিন ব্যাপারটাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সেটল করার চেষ্টা করত। শেষ এক বছরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। মা-বাবা বা অনুজা এখন কিছু বললেই হাবা-কালা'র যৌথ ভূমিকা নেয়।

মা একটু পুরনোপন্থী। ঠাকুর-দেবতা বা ছোঁয়াছুঁয়িতে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাসী। অনুজার সঙ্গে মায়ের ঠোকাঠুকির মূল এপিসেন্টারটা এখানেই। চাকরি করার জন্য সপ্তাহের অন্যদিন সেভাবে সময় না পেলেও রবিবার অনুজা রান্নাঘরে সখের রাঁধুনির ভূমিকায় খেলতে নামে। পেঁয়াজ কেটে অনুজা নুনের পাত্রে হাত রাখলেই মা ধর্মরক্ষার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বাবা-মায়ের পক্ষ নিলেও তুহিন নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে। তার জন্য অবশ্য বিশ্বযুদ্ধের কোনও খামতি থাকে না।

শেষ কয়েক মাসে নিজের অফিসের ওয়ার্কলোড একটা ভয়ংকর জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। কানের কাছে বকবকানি শুনতে একদম ভালো লাগছিল না। অনুজাকে থামানোর চেষ্টায় বলে উঠল তুহিন, 'সপ্তাহে একটা দিনই তো বাড়ি থাকো। সে দিন কানে তুলো গুঁজে রাখলেই হয়।'

—তুমি কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছ, থমথমে মুখে বলে উঠল অনুজা।

—অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। ফারদার যাতে ঝামেলা না হয়, তা এড়ানোর চেষ্টা করছি।

—তো, একেবারে এড়িয়ে গেলেই হয়। গড়িয়ার ফ্ল্যাটটা এখনও বিক্রি হয়নি।

—এখুনি এত টাকা কোথা থেকে পাবো?

—লোন নাও। তোমার অফিস খারাপ নয়। আমার কলেজের চাকরি। দেখতে দেখতে শোধ হয়ে যাবে।

—আমার কোনও ভাই-বোন নেই। বাবা-মা'কে ফেলে...

—আর আমি! এটুকু কমিটমেন্ট পরস্পরের প্রতি রাখব বলেই তো বিয়ে করেছিলাম!

—দ্যাখো, অনেক রাত হয়েছে। প্লিজ, কলেজের লেকচারটা এখানে আর ড্র্যাগ করে টেনে নিয়ে যেও না।

—ডিসগাসটিং! গো টু হেল।

ঘরের আলো নিভে যায়।

পেগটার দিকে তাকিয়েই মাথাটা যেন বোঁ করে ঘুরে গেল তুহিনের। চিন্তা-ভাবনা ভেতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সামনের অনেক অবয়বকেই ধোঁয়ায় ঢাকা মনে হচ্ছে। নাঃ, এই পেগটা অর্ডার দেওয়া উচিত হয়নি। বাড়ি ফিরতে হবে। গাড়িটাও চালাতে হবে নিজেকেই। কিন্তু সত্যিই কি বাড়ি ফিরতে হবে! বাড়ি ফিরে করবেই বা কী? বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মা, টেবিলে ঢাকা খাবার আর একাকীত্বের ঘেরাটোপের এক বিচিত্র বন্দি দশা।

এক চুমুকে গ্লাসের অনেকটা খালি করে দিয়ে ইশারায় বেয়ারাকে ডাকল তুহিন। ব্লু-হেভেন বারের নিয়মিত কাস্টমার ও। ম্যানেজার, বার টেন্ডার বা বেয়ারা সবাই প্রায় চেনে ওকে। ইশারায় বিলটা আনতে বলে।

পাশের টেবিলে চন্দ্রকান্তবাবু। চোখ পড়তেই তুহিনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। রোজ আসেন। কিন্তু কখনও দু'পেগের বেশি খান না। ওর নিজের মদ খাওয়ার পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে।

—উঠছ নাকি? জিজ্ঞাসা করলেন চন্দ্রকান্তবাবু।

হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল তুহিন। কথাবার্তা আজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে নেই।

—এবার একটা বিয়ে-থা করো।

চন্দ্রকান্তবাবুর কথায় মৃদু হাসল তুহিন। বিয়ে কি সত্যিই করতে পারবে কোনওদিন আর কাউকে! দিল্লিতে পড়তে চলে গেল অনুজা। আর ফিরেই এল না। তারপর একদিন শুনল কোন এক প্রোফেসরকে বিয়ে করে সেটেলড হয়ে গেছে। অনুজা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও মেয়ের কথা কোনওদিন মনেই আসেনি। অনুজা ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে বউ হিসাবে মেনে নিতে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তা তুহিনের নেই।

ধীর পায়ে বারের বাইরে আসতে মাথাটা যেন চক্কর দিয়ে উঠল। ভাসমান শরীরটাকে ড্রাইভারের সিটে রেখে স্থির হওয়ার চেষ্টা করল তুহিন।

সামনের পথ ততক্ষণে বড় অন্ধকার আর অনিশ্চিত লাগছে।

পাশ ফিরল তুহিন। বোধহয় একটু বেশি ভেবে ফেলছে। কী হবে, না হবে, এত আগে থেকে ভেবে লাভটা কী! মনের মধ্যে ফুটে উঠছে অনেক জলছবি। উঠে বসল। তৈরি হতে হবে এবার। অনুজাকে ছাড়তে ও হাওড়ায় যাবে...

কবিতা

বসন্ত পেরোলেই রাত

আবু জাফর খান

প্রেম ছুঁতে গিয়ে
তাকিয়ে দেখি দূরে উড়ছে কয়েকটি পর্বত
প্রগাঢ় মেলবন্ধনের স্তুতি সেইখানে
বিরল প্রতিভার এই পর্বতমালা মানুষের ধারণাকে বদলে দেয়
আমি তাই জোনাকির মতো জনান্তিকে
অন্তবিহীন যাত্রায় প্রেমিকাহীন প্রেম খুঁজি।

নিভৃতে শতধা বেড়ে উঠে প্রবাহিত হয় আঁধার
সূর্য দেখি না
না দেখি সন্ধ্যার বেণুবন
পলগুলো ভারী হতে হতে পাথরের ভাস্কর্য সম্মুখে দাঁড়ায়;
একদিন তোমাকে নদী বলে ডেকেছিলাম বলেই—
প্রবাহ রয়েছে জেগে এখনও,
তবু এই লোকালয় কোঠাবাড়ির ভেতরে ঢুকে লুপ্ত হয়ে যায়
চাঁদের মুখে এঁকে দেয় কালো নকশা।

প্রেম ছুঁতে গিয়ে
দেখি একটি জলস্তম্ভ ভ্রূণের মতো ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে
মাথার ওপরে বিষনীল আকাশ ওড়ে
আমার পায়ের নীচে
ঘুঙুরের তালহীন শব্দের মতো অন্ধকার নামলে—
কেউ যেন গান গায়,
যে গান কেবল মৃত্যুযাত্রীরা শুনতে পায়।

সবকিছু মিলে
শেষ অবধি ক্লান্তি নেমে আসে সমস্ত সরণিতে,
আর লতাগুল্মের ওপর পড়ে থাকে অতীত রৌদ্রের ইতিহাস
আর তোমার ইশারার ওপর দিয়ে ছুটে যায় একটার পর একটা
দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

দৃষ্টি

অনু ইসলাম

জনৈক, সন্ধানকারীর চোখ অন্ধকারের দিকে—
মর্মজ্ঞানে; আলোর সন্ধানই মুখ্য।
খনন চলছে এক-একটি আলোর উপত্যকা

শূন্যোৎসবে যুগ্ম-অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে ইশারায়!
কিছুটা বর্ণক্রম ভাঙার কৌশলে পথ হাঁটুক আগামী—

এই যে দীর্ঘ এক জীবন-চূড়া; ভাঙছে প্রতিক্ষণ!
জীবন ভাঙতে ভাঙতে অন্ধকার ভাঙছি—
অন্ধকার ভাঙতে ভাঙতে; যেন—
আলোর স্ফূরণ ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর ঘাসে...

মূলত, অন্ধকার ভেঙে আলোর সন্ধানেই হাঁটছি...

দূরত্ব

বুবুসীমা চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার নামার আগেই এত অন্ধকার পথে
হাঁটিনি আগে, নিয়তির আকণ্ঠ হেমলক পান করেও
টলিনি এত! নিজের দুহাত নিজের থেকে দূরে
সরে সরে যায় সময়ের প্যাঁচে,
নীরবতা এত কথা বলে
বুঝিনি কখনও। লোনা জলে চোখে
এতো জাহাজ ভাসে দেখিনি জীবনে। ঝাপসা
হয় স্মৃতিকণা অটল স্তম্ভ। বিনিসুতো মন কীভাবে
পুড়েছে, জ্বলে ছাই হয়ে উড়েছে সর্বসত্য।
অকাট্য পৃথিবীতে
রয়ে যাবে পোড়া কাঠ আর বাদামি দুপুর?
অন্তরঙ্গ বটবৃক্ষের ডালে যেদিন বসবে নতুন পাখি
জানি ভুলে যাবে চোখ তোমার, অতীতের দৃশ্যসকল!

রবিবারের বৈঠক

যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ২৯ এপ্রিল ২০১৮

ইউনিকোড হরফে লিখে জানান রবিবারের বৈঠক সম্পর্কে আপনার মতামত। সেরা মতামতটি প্রকাশিত হবে 'বৈঠকের বিশেষ পাঠক' বিভাগে।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বাংলা ছোটগল্পে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন: সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম

কার্তিককুমার মণ্ডল *গবেষক,*
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

(গত সপ্তাহের পর)

২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সিঙ্গুরের বিডিও অফিসে র‍্যাফ ও পুলিশের ঘেরাটোপে জমি বিক্রির চেক বিলির চেষ্টা করা হয়। সারাদিন শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত কয়েক হাজার নারী-পুরুষ-শিশুর ওপর রাত ১.৪০ নাগাদ র‍্যাফ ও পুলিশের অতর্কিত আক্রমণে কয়েকশো মানুষ আহত হন। সাংসদ মমতা বন্দোপাধ্যায়, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-সহ ৭৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। সেদিনের সেই পুলিশি নির্যাতনের কথা তথা নারীদের প্রতিবাদী মানসিকতা অনেক গল্পকারের লেখনীতে উঠে এসেছে। যেমন- শর্মিলা ঘোষের 'হেই সামালো' গল্পে সিঙ্গুরের ব্লক-অফিসে জমি কেনা-বেচার আসরের প্রেক্ষিতটাই গল্পের মূল বিষয়। এই আন্দোলনে মেয়েরা যে সামনের সারিতে ছিল তার কথাই উঠে এসেছে। কাঁচা টাকার লোভ যে পুরুষ মানুষের আছে একথা ভালো করে বোঝে মানদা। জমি যে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পদ, তাকে হাতছাড়া করা যাবে না, এ-কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করে বলেই দুই বউ আর নাতনি নিয়ে ব্লকঅফিসের দিকে হাটা দিল মানদা। 'সেখানে গিয়ে দেখে বেশিরভাগ পুরুষদেরই মেয়েরা ঘিরে রেখেছে। যেতে দিচ্ছে না'। ব্লক অফিসে মেয়েদের ভিড় দেখে মানদা অবাক হয়। সে দেখে জমি বাঁচানোর তাগিদে সাবিরের আম্মা-ফতেমা থেকে মাখনের বুড়ি দিদিমা সবাই হাজির। এ লড়াই আর দু'দলের নয়। জমির মালিক আর সেই জমিতে খেটে খাওয়া মানুষের কথা মানদা ছোট ছেলের কাছে জেনেছে। এই ভিড় দেখে ছোট ছেলের কথা সত্য মনে হয়। হঠাৎ নাতনি ছুটে এসে মানদাকে বলে, 'ঠাম্মা ওইখানে লাঠি চার্জ হচ্ছে। ছোট কাকারা মার খাচ্ছে। শিগগির চলো'। কথাটা শুনে, ডান হাতে লাঠিটা বাগিয়ে বাঁ হাতে পূর্ণিমার হাত ধরে ব্লক-অফিসের দিকে ছুটতে থাকে মানদা। পিছনে পিছনে নাতনিও। গল্পকার এখানে তিন প্রজন্মের লড়াকু মানসিকতাকেই উপজীব্য করেছেন। ছোট কাকা আগেই গেছে। এবার ছোট কাকার আগের প্রজন্মের প্রতিনিধি মানদা। তার সঙ্গে নাতনি। অর্থাৎ এ লড়াই শুধু একার নয় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার লড়াই।

সিঙ্গুর আন্দোলনে মেয়েদের অবস্থান ছিল প্রথম সারিতে। এ প্রসঙ্গে 'অনীক' পত্রিকার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সংখ্যায় 'বহিরাগত'-র রোজনামচা' শীর্ষক গার্গী সেনগুপ্তের রচনা উল্লেখ্য মনে হয়। তিনি লিখেছেন, ২০০৬-এর মে মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে-কটি মিছিল সংগঠিত হয়েছে, মেয়েরা সর্বদাই সামনের সারিতে থেকেছে। কোনওরকম অবান্তর তুলনায় না গিয়েও বলা যায়-এটা কম কথা নয়, মেয়েদের এই প্রতিবাদী সত্তা সত্যিই চমকৃৎত করে। এই মেয়েরা, যাঁদের অধিকাংশের বাবার ভিটে এবং শ্বশুরের একই বা পাশাপাশি গ্রামে, খুব বেশি হলে সিঙ্গুর ছাড়িয়ে হরিপাল বা নাসিবপুর পর্যন্ত এঁদের চেনা জগৎ, তাঁরা সর্বস্বান্ত হওয়ার আতঙ্কে, ভিটেমাটি বাঁচাবার তাড়নায় পথে নেমেছেন...।' উপরোক্ত শর্মিলা ঘোষের গল্পে তার যেমন উল্লেখ আছে, তেমনই অনেক গল্পকারের লেখনীতে সে প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। 'শারদীয় দৈনিক স্টেট্‌সম্যান' ১৪১৪-এর পাতায় অচিন রায় অত্যন্ত স্পষ্টতায় সে-কথাই তুলে ধরেছেন তাঁর 'ধরিত্রী' গল্পে। মহিলা সাংবাদিকের চোখে শিল্পায়নের সংকটকে বাস্তবসম্মত করে পরিবেশনে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। গল্পের শুরুতেই নেতিবাচক বিশেষণের আধিক্য লক্ষ করার মতো, চন্দননগরের কোর্ট চত্বরে ঢুকে দেখি নরক গুলজার। চারিদিকে লোক গিজগিজ করছে। আমার মতো সেলফোন হাতে সাংবাদিক, ক্যামেরা ঘাড়ে টিভি ক্যামেরাম্যান, ডাণ্ডা হাতে পুলিশ ঝাণ্ডা হাতে পার্টিম্যান, শ্যমলাপরা ঘাঘু উকিল, প্লেন ড্রেসে ঘুঘু দালাল এবং স্বয়ং কোর্টেশ্বর শিবের এজেন্ট 'ফোঁটা কাটা পুরুত'। এ থেকে সচেতন পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে গল্পকার শিল্পায়নের বিপক্ষে বলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। এই গল্পে গল্পকার অচিন রায় অত্যন্ত স্পষ্টতায় তুলে ধরেছেন 'সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনকে। তাই দেখি টাটা কোম্পানির মোটরের কারখানা গড়ার জন্য সরকারিভাবে সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের জন্য বিডিও অফিস থেকে চাষিদের জমির টাকা দেওয়া হচ্ছে। ধরিত্রীর ছেলে যখন জমির শোকে নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে ঠিক তখনই ধরিত্রীর কালকেউটের মতো তেজি বৌমা কোলের ছেলেকে নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। এজন্য মা-ছেলে দুজনকেই চালান হতে হয় খচরা পুলিশের হাতে। তাই অনেকের মতো তাকেও সেদিন কোর্টে তোলা হয়। আর কোর্ট চত্বরেই গল্পকথক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে ধরিত্রীর সাক্ষা ঘটে। তখনই ধরিত্রীর কাছ থেকে যে সব জেনেছে সেগুলি সবই শিল্পায়নের বিপক্ষে ঘটে চলা বিবরণ। বিবরণ পাই সরকারি পক্ষের উকিলকে কীভাবে বিরোধী পক্ষের উকিল কুপোকাত করছে তাকেও। ধরিত্রীর বাড়িতে গেলে গল্পকথক জানতে পারেন তার জীবন সংগ্রাম ও দাম্পত্য জীবনের কথা। গল্পকথককে তখনই জানায়, 'লাল পার্টির লোকগুলো বড্ড হারামি', আর এই লালপার্টির হারামিগুলো'র হাত থেকে কীভাবে সে তার সংসারকে বাঁচিয়েছে তাও জানা যায়। গল্পের শেষে নাম না করে সিঙ্গুরের তাপসী মালিকের মৃত্যু প্রসঙ্গও এসেছে, এমনই ঘটনার ঘনঘটায় একদিন খবর এল সিঙ্গুরের মাঠের ধারে নাকি এক কিশোরীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে এ কিশোরী তাপসী মালিক। গল্পকারের উদ্দেশ্য ধ্বনিত হয়েছে ধরিত্রীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে, আমি জানি যে মাটিতে লোক পড়ে, সেই মাটি ধরেই সে ওঠে। যারা অন্নদাতা ভূমিকে বলাৎকার করে, অল্প বয়সি মেয়েকে ধরে বলাৎকার করে মারে, তারা নরপিশাচ, তারা প্রয়োজনে নিজের মাকেও বলাকারের শিকার করতে পারে। ...আমি বলছি তোমাকে নিরীহ মেয়ের বলাৎকারের ফলে ঝরে পড়া বিন্দু বিন্দু রক্ত থেকে রক্তবীজের ঝাড় তৈরি হবে। তারাই এই নরকাসুরের ঝাড়ে বংশে নিব্বংশ করবে। মনে হচ্ছে যদু বংশের ধ্বংসের আর বেশি দেরি নেই...।' কাহিনি বিন্যাসের শিথিলতায়, পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিতে ও লেখকের সাংবাদিকধর্মিতায় গল্পটি আবেদনক্ষম হয়ে ওঠেনি।

(চলবে)

ধারাবাহিক উপন্যাস

অগ্নিঋষি

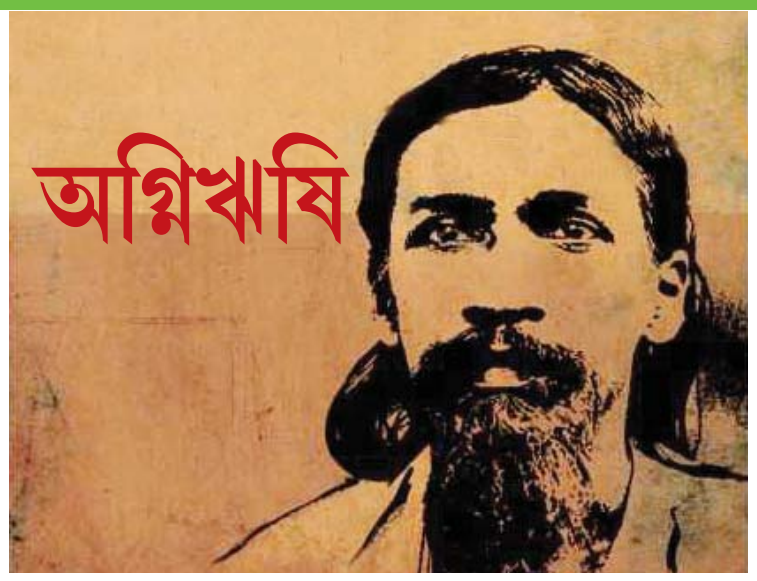

অভিজিৎ চৌধুরী

(গত সপ্তাহের পর)

এখনও তিনি অরবিন্দের কথা শুনছেন। মনে হচ্ছে পাগলের প্রলাপ। জেল জীবন তিনি মেনে নিতে পারেননি। অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। এখন পালানোর চেষ্টা করছেন। সবটাই বুজরুকি। রাজনৈতিক আন্দোলনকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করলে এরকম বিভ্রমের নির্মাণ হয়। প্রায় সকলেই চলে গেলেও উপেনের সঙ্গে আরও দুজন রয়ে গেলেন। শচীন আর দেবব্রত। শচীনের বয়স মাত্র ১৭।

শচীন বলল, 'অরবিন্দবাবু, আপনি সাধনা করে কী পেলেন?'

শচীনকে খুব স্নেহ করতেন অরবিন্দবাবু। তিনি শচীনের কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বললেন, 'যা খুঁজছিলাম, তাই পেয়েছি।'

তারপর তিনি অন্তর্জগতের এক অপূর্ব কাহিনি বর্ণনা করলেন। যেসব সাধনা তিনি নিরন্তর করে চলেছেন তার মধ্যে তন্ত্র রয়েছে যদিও তিনি প্রকাশ্যে এই সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

উপেন, দেবব্রত, শচীন অনেক কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝলেন এই অরবিন্দ ঘোষ অন্য এক অগ্নিঋষি। এই মানুষটির জীবনে সম্পূর্ণ অন্য এক অধ্যায় শুরু হয়েছে।

দেবব্রতের মধ্যেও আধ্যাত্মিকচর্চা প্রবল ছিল। জেলের মধ্যে তিনিও কখনও কখনও ধ্যান করতেন।

সেই দেবব্রত বললেন, 'এবার— অরবিন্দবাবু, নিয়তি কী?

অরবিন্দবাবু বললেন, 'কালের ভূমিতে দাঁড়িয়ে কল্পনা করা যেতে পারে সৃষ্টির গোড়ায় সবটা ছিল অসাড় অন্ধতমঃ। তার মধ্যে শক্তির স্পন্দন জাগল প্রথম ঋষির ভাষায় তাকেই নিঋতি বলে। ক্রমে দেখা দিল ঋতের ছন্দ। আমরা তাকে বলি প্রকৃতির আইন।'

দেবব্রত বললেন, 'তপস্যা তবে কী?'

—শক্তির বিক্ষেপকে একটি ছন্দে ধ্রুবের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারার প্রয়াসই তপস্যা।

দেবব্রত বললেন, 'তার মধ্যে কি ক্ষয়-অক্ষয় দুয়ের প্রকাশ ঘটছে?'

অরবিন্দবাবু দেবব্রতের জিজ্ঞাসা শুনে খুব খুশি হলেন। এক আশ্চর্য প্রশান্তি তাঁর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেল।

তিনি বললেন, 'শক্তির ক্রিয়াকে চলতে দিতে হবে তা হল ক্ষয়ের ভাব। আর তাকে বেচাল হতে না দেওয়া হচ্ছে অক্ষয়ের প্রশাসন।'

দেবব্রত বললেন, 'মহাশয় অভিনিবেশ কী?'

অরবিন্দবাবু বললেন, 'আমি শূন্যমনে বসে আছি। বাইরের দৃশ্য দৃষ্টিপথে ভেসে চলেছে। কোথাও নিবদ্ধ হচ্ছে না। সবই দেখছি, কিন্তু মনকে কোথাও নির্দিষ্ট করছি না। হঠাৎ দৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু একটা জেগে উঠে ইন্দ্রিয়বোধকে সজাগ করল— চেতনা গুটিয়ে এসে নির্দিষ্ট হল পরিদৃশ্যের একটি বিন্দুতে। গোধূলির আকাশে যেন একটি তারা ফুটল। চারপাশটা আবছা হয়ে এল। চলতি ভাষায় বলে তন্ময়তা আর দার্শনিক সংজ্ঞা হল অভিনিবেশ।'

বারীনের স্বভাব তাঁর সেজদার বিপরীত। কখনও কখনও গীতা আওড়ালেও তিনি আসলে মজলিশি যুবক।

ব্রিটিশ পুলিশ অনেক নিরীহ যুবককেও বিপ্লবী ঠাওরে জেলবন্দি করেছেন। তাঁরাও মোকদ্দমার আসামি। বিপুল সেরকমই একজন যুবক। তার বাড়ি টালার কাছাকাছি।

সে বলল, 'বারীনদা, 'যুগান্তর' পত্রিকার গল্প আজ করুন।' বারীন যেন এরকম আড্ডায় চাইছিলেন। তিনি হতে চেয়েছিলেন কবি। হয়ে গেলেন অগ্নিবিপ্লবী। কতকটা মাস্টারমশাই দেওস্কর আর কতকটা বরোদায় সেজদা। এখন বেশ আক্ষেপ হয়। মৃণাল-বউদির সঙ্গে খুনসুটির দুপুরগুলি মনে পড়ে। তাঁর বিখ্যাত হওয়ার বাসনা শেষে সহিংস পথে কখন যে বইতে শুরু করল, তা তিনি নিজেও টের পাননি।

এক উকিল বন্ধু বললেন, 'ভাই, তুমি পারবে?'

বিপুল বলল, 'হঠাৎ তিনি এরকম বললেন।'

বারীন বললেন, 'তাঁকে বলেছিলাম আমার যুগান্তরী সংকল্প।'

মানুষ তো জন্ম অপরাধী হয় না। বারীনের কবি মন এটাই বলত। সেই সত্তা থেকে বারীন অনেক খুন-খারাপির অপরাধীর সঙ্গেও প্রাণখুলে কথা বলতে পারতেন।

ওসমান বলে একজন ছিল, সে ভালো উর্দু শায়েরি জানত। খুন করেছিল নিজের মায়ের পেটের ভাইকে। ভাবীকে সে ভালোবাসত। যাকে বলে আশনাই। তাকে দেখলে বারীন বলতেন, 'মধুরে বহিবে বায় ভেসে যাবে রঙ্গে।'

ওসমান রাগ করত না। বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশতে তার ভালো লাগত। কখনও কখনও সে বলত,'আল্লা কসম বারীন ভাই, এই জেল থেকে কখনও যদি ছাড়া পাই ফিরিঙ্গির খুনে রাঙা করব দুই হাত।

ওসমানও এসে বসল।

বারীন বললেন, 'বুঝলি ওসমান— মুধুরে বহিবে বায় ভেসে যাব রঙ্গে। তবে সেটা নারীর প্রেম নয়, সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' বের করব ঠিক করলুম।'

বিপুল বলল, 'সেই সর্দার যেন কী বলেছিলেন?'

এই গপ্পো আগেও করেছেন বারীন কিন্তু অসমাপ্ত থেকে গেছে।

সর্দার ছিল বিপ্লবী দল থেকে ডিভোর্স নেওয়া। সে তখন আমাদের পরম শত্রু। সে বলে বেড়াচ্ছিল বারীন নাকি দিস্তে দিস্তে কাগজ ছেপে দেশোদ্ধার করবে।

বিপুল বলল, 'বারীনদা— ২৭ কানাই ধর লেনে ঘর ভাড়া নিলেন।'

বারীন বললেন, 'হ্যাঁ। প্রথম সংখ্যা ছাপলুম ১১০০ কপি বাগবাজারের কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে। সেদিন ছিল চৈত্র, ১৩১৩ বাংলা সন।'

ওসমান বলল, 'বারীনভাই— ভারতের ভাগ্যের আকাশে সেদিন এক নতুন শক্তির উদয় হল।'

হঠাৎ চোখে জল চলে এল বারীনের। এই তাঁর এক রোগ। ছিচকাঁদুনে স্বভাব। ওসমানকে চিবুক ধরে আদর করলেন বারীন।

তখন অবিনাশ কটকে বায়ু পরিবর্তনে গেছে। তাকে তলব করলুম। অবিনাশ এল আর গ্রাহকও তৈরি হল।

(চলবে)

ভ রে আ ছি স্মৃ তি সু ধা য়

‘দিল্লি কা লাড্ডু, নাম শুনেছ তো?’

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

কাশী থেকে ফিরে আসার পর বাবার মনে দারুণ ভ্রমণের নেশা ধরে গেছে। পরের বছর ১৮ ফাল্গুন বাবা আমাদের নিয়ে চললেন তীর্থযাত্রায়। নির্দিষ্ট দিনে পাড়ায় হরিদার মোটরে হাওড়া স্টেশন। বাবার অফিসের বন্ধুরা এলেন ট্রেনে চাপিয়ে দিতে। আবার সেই দেরাদুন এক্সপ্রেস। এবার যাত্রা হরিদ্বারে।

হরিদ্বার তখন বনময়। আমরা উঠেছিলাম ভোলাগিরি ধর্মশালায়। শূন্য ধর্মশালায় আমরাই শুধু যাত্রী। দোতলায় একটি ঘর পেলাম আমরা। সেই ঘরের জানালার ধারে বসে আমি মনসা পাহাড়ের গভীর জঙ্গলের বুক চিরে ট্রেনের যাতায়াত দেখতাম। এই ধর্মশালার পিছনে তখন কোনও ঘরবাড়ি ছিল না। স্থানটি ছিল হলকা বনভূমিনতে ভরা। আমার বয়স তখন বারো। ১৯৫৩ সাল।

একদিন তো তন্ময় হয়ে জানালার ধারে বসে অরণ্যের শোভা সৌন্দর্য দেখছি এমন সময় দরজা খোলা পেয়ে একটা বাঁদর ধরে ঢুকে আমাকে চোখ রাঙিয়ে চিনির পুঁটুলিটা নিয়ে পালাল। পরে অবশ্য আমিই ধর্মশালার পিছনে গিয়ে উদ্ধার করলাম সেটা। বানরটা সম্ভবত সকালের চেঁচামেচিতে ভয় পেয়েই ফেলে দিয়েছিল সেটা।

একদিন সকালে বাজার থেকে এসে বাবা আমাকে নিয়ে মনসা পাহাড়ে উঠতে গেলেন। মা ছিলেন লকড়ির (কাঠ) জ্বালানিতে রান্না করায় ব্যস্ত। তাই মা গেলেন না। কিন্তু গভীর অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে মনসা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে জঙ্গলের ভয়াবহতা দেখে ফিরে এসেছিলাম আমরা। পরদিন অবশ্য কাঠুরিয়াদের সাহায্য নিয়ে বাবা, মা আমি তিনজনেই পাহাড় উঠেছিলাম সংকীর্ণ সরু পথ বেয়ে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। আজ থেকে কত বছর আগে। সেদিনের সেই প্রাকৃতিক অবস্থা আজকের কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আমিই কি পারি? গঙ্গার জলকল্লোল ও পাহাড়ি গাছের বুনো গন্ধে ভরা সেই হরিদ্বার আজ আর নেই।

তবে একজন কিন্তু আমার সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে আজও বেঁচে আছে। সে হল সতীয়া। আমারই বয়সি কি আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট রূপসুন্দরী দারুণ ফুটফুটে এক মেয়ে। এই ধর্মশালার যিনি ম্যানেজার তিনি সপরিবারে ওই ধর্মশালারই একটি ঘরে থাকতেন। তাঁরই এক ছেলে এক মেয়ের মধ্যে সতীয়া আমার খেলার সাথী হয়ে গেল। ঠিক সেই কাননের মতো। হরিদ্বারে আমরা সাতদিন ছিলাম। সারাটা দুপুর ধরে ধর্মশালার সর্বত্র হুটোপাটি করতাম আমরা।

হরিদ্বার থেকে একদিন আমরা টাঙায় চেপে কনখল বেড়াতে গেলাম। কনখলও তখন বনয়া ও যাত্রীবিহীন। পৌরাণিক যুগের দক্ষরাজার সেই প্রাসাদ তখনও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়েছিল। দেখে মনে হল যেন বিশাল সেই প্রাসাদ ভয়াবহ কোনও ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে। পুরাণ বলে, সতীর দেহত্যাগের পরে শিবের অনুচরই এই ধ্বংসলীলা ঘটিয়েছে। যাই হোক, সেই পৌরাণিক নিদর্শনের সবকিছুই লুপ্ত হল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে।

কনখল থেকে ঘুরে আসার পর একদিন গেলাম ঋষিকেশ লছমনঝুলায়। তখন বাস ছিল না। তাই ট্রেনেই গেলাম। ঋষিকেশ স্টেশন থেকে গঙ্গার ত্রিবেণীঘাট যেতে বনময় শিবালিক পর্বতের মেঘবরণ রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। এখন ঘিঞ্জি শহরের সুউচ্চ প্রাসাদমালার আড়ালে সে-দৃশ্যও আর চোখে পড়ে না।

ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ থেকে আমরা হাঁটাপথে চললাম লছমনঝুলার দিকে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এই পথটুকু টাঙায় চেপে যাওয়ার। কিন্তু ভাড়া না পোষানোয় হাঁটতেই হল। ইতিমধ্যে আমি ঋষিকেশ থেকে প্রকৃতির দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে পথ চলার সময় জোর একটা হোঁচট খেয়েছি। পায়ের একটা আঙুল কেটে রক্তও বেরিয়েছে খুব। তবু ওই অবস্থাতেও জনহীন প্রান্তর ধরে হেঁটেই চললাম। পথে পড়ল ধূ ধূ করা নির্জন প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা দুরন্ত চন্দ্রভাগা নদী। উপলখণ্ডে পা রেখে সেই নদী পার হওয়ার আনন্দের কথা কখনও ভুলব না আমি।

একসময় আমরা লছমণঝুলায় এলাম। এখানে তখন দারুণ বাঁদরের উপদ্রব। তা একটা বাঁদর হঠাৎ কোথা থেকে লাফিয়ে পড়ে আমার মায়ের হাত থেকে খাবারের জায়গাটা কেড়ে নিতে গেল। পারল না অবশ্য। স্থানীয় লোকজন লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেই রাগে মাকে একটা চড় মেরে পালাল।

সেই সময়কালে লছমনঝুলার পোলের ওপর দাঁড়িয়ে দু'পাশের পর্বতমালায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার যে কী আনন্দ ছিল আজ আর তা ভাবাই যায় না। সেই নয়নমনোহর দৃশ্যাবলী এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। এরপর বড় হয়ে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেও ওখনকার প্রকৃতি এখন আর আমাকে আকর্ষণ করে না। করবেই বা কী করে! প্রকৃতি যে এখন আমারই মতো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখন তাই স্মৃতিসুধায় ভরে থাকি। মনে মনে অমৃত মন্থন করি।

লছমনঝুলার ঝুলা পুলের নীচে খরস্রোতা কল্লোলিনী গঙ্গার প্রবাহ মন কেড়ে নিল আমার। শয়ে শয়ে মহাশোল সেই শ্রোতের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে কিলবিল করছে। এরপর আমরা ওপারে গিয়ে পাহাড়ের কোলে আঁধারঘন বনাকীর্ণ আম্রকাননের গা ঘেঁষে এগিয়ে চললাম কালীকমলি আশ্রমের দিকে। সম্পূর্ণ জনহীন পথ। একটু ভয় ভয় করলেও এগিয়ে চললাম সবাই। একসময় পৌঁছলাম।

এখানে বাবা কালীকমলিওয়ালার আশ্রমই তখন দ্রষ্টব্য ছিল। এই জায়গায় এখন অনেক মঠ-মন্দির হয়েছে। তবে নীতা ভবনই প্রসিদ্ধ। দর্শন শেষে বিনি পয়সায় ‘বাবা কালীর’ খেয়া পার হয়ে এপারে এলাম। তারপর আবার পদব্রজে ঋষিকেশ স্টেশনে।

হরিদ্বার থেকে এবার চললাম কুরুক্ষেত্রে। হরিদ্বার ছেড়ে যাবার সময় সতীয়ার জন্য আমার খুব মন কেমন করতে লাগল। আসলে তখন একটু বড় হয়েছি তো। তাই সুন্দরী সতীয়াকে বিয়ে করারও একটা বাসনা জেগেছিল মনে। কিন্তু মনে কিছু উদয় হলেও বাস্তবে তো তা সম্ভব নয়। তখন তো আমিই নেহাত ছেলেমানুষ। শিশু থেকে বালক। কৈশোরের ঘরে পা রাখতে চলেছি সবে। যাই হোক, হরিদ্বার থেকে ট্রেনে প্রথমে আমরা এলাম আম্বালা ক্যান্ট-এ। যেখান থেকে মধ্যরাতের ট্রেন কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রকে ও দেশীয় লোকেরা বলত কুরুছেতর। হরিদ্বারকে বলত হরদোয়ার। শেষরাতে যখন আমরা কুরুক্ষেত্র স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম তখন হোগলার ছাউনি দেওয়া প্ল্যাটফর্মে কেরোসিন ল্যাম্প হাতে একজন চেকার আমাদের টিকিট নিলেন। বাকি রাতটুকু স্টেশনে কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটলে আমরা সেখানকার ভারত সেবাশ্রম সংঘে গিয়ে উঠলাম।

করুক্ষেত্রের জনমানবহীন লালমাটির ধূ ধূ প্রান্তরে তখন কোনও জনবসতি ছিল না। তবে তখনকার ভারত সেবাশ্রম সংঘের পরিবেশ ছিল অতি মনোরম। এই নিয়ে আমার দ্বিতীয়বার ভারত সেবাশ্রম সংঘে আসা। সংঘ তখন একতলা। মাত্র দুটি কি তিনটি ঘর ছিল যাত্রীদের থাকার জন্য। স্বামীজিরাও ছিলেন দারুণ সুন্দর। আশ্রম-সংলগ্ন বাগানে ছিল বিশালাকার সূর্যমুখীর বাহার। আর ছিল উর্বর জমির গুনে অতিকায় গাঁদা ফুলের গাছ। সেই ফুলে মালা গেঁথে পরানো হতো স্বামী প্রণবানন্দজিকে। স্বামীজিরা আমাকে ওই ফুলের বীজ দিয়েছিলেন কিছুটা। তাই থেকে আমি বাড়ি এসে টবে গাছ লাগিয়েছিলাম। সে ফুলও দেখবার মতো হয়েছিল। এখানে আমরা তেরাত্রি বাস করেছিলাম। এরই মধ্যে একদিন পদব্রজে অনেক দূরের গ্রাম পেরিয়ে থানেশ্বর শিষ ও ভদ্রকালী দর্শন করে এলাম। অবশ্যই প্রাণ হাতে নিয়ে। দুটি জায়গাই তখন যাত্রীহীন ও বনময়।

কুরুক্ষেত্র থেকে এবার আমরা গেলাম দিল্লিতে। যাওয়ার পথে ট্রেনে এক পরিবারের বর-কনে যাচ্ছিল। তারা আমাকে ভালোবেসে দারুণ সুস্বাদু লাড্ডু দু-একটা খাওয়ালেন। আমার মা-বাবাকেও দিলেন। আমাকে বললেন, ‘দিল্লি কা লাড্ডু। নাম শুনেছ তো? এই হল সেই আসল দিল্লি কা লাড্ডু।’ কী তার স্বাদ। শুধু তাই নয়, নিমন্ত্রণও জানালেন ওঁদের বাড়িতে। ঠিকানা লিখে দিলেন। আমরা দিল্লির ধর্মশালায় উঠলাম। তাঁদের বাড়িতে গেলে সেখানেও অনেক লাড্ডু খাওয়ালেন তাঁরা।

দিল্লিতে গেলেও বাবা আমাদের কিছুই দেখালেন না। মাত্র এক রাত থেকেই পরদিন চলে এলাম আগ্রায়। আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের কাছে একটা ধর্মশালায় উঠেছিলাম আমরা। আগ্রায় তাজমহল দেখার ব্যাপারে বাবা অবশ্য না করেননি। যেদিন গেলাম সেদিনই দুপুরে যাতায়াত এক টাকা ভাড়ায় একটি টাঙা নেওয়া হল তাজমহল দেখতে যাওয়ার জন্য।

জীবনে প্রথম তাজমহল দেখার স্মৃতি ভোলবার নয়। কেননা তা আমার কাছে যেমনই আনন্দের তেমনই বেদনা ও অভিশাপের। যে অভিশাপের বোঝা এখনও আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। তাজমহলও তখন যমুনা কিনারে এক অতি নির্জন প্রান্তরে। তাজমহলে তখন বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল না। দর্শন করতে কোনও টিকিট লাগত না। ভরদুপুরে দর্শনার্থীও আমরা তিনজন। দর্শকহীন তাজমহলের চারদিক ঘুরে দেখে যখন আমরা নীচে নামলাম শাজাহান ও মমতাজের সমাধি দর্শনে, তখনই ঘটল বিপর্যয়। বিনা পয়সায় যে সরকারি গাইড আমাদের নিয়ে গেল সেখানে, সে করল কি আমার হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন দিয়ে নিজে টর্চ হাতে সবার আগে চলল সেই ঘন অন্ধকার সমাধি কক্ষে ইতিহাসের কাহিনি বোঝাতে বোঝাতে। ইতিমধ্যে আমার অন্যমনস্কতায় হঠাৎই হাত ফসকে পড়ে গেল হ্যারিকেনটা। সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকেনের কাচ ভেঙে তেল উপচে যাচ্ছেতাই একটা ব্যাপার ঘটে গেল। হ্যারিকেনটাও নিভে গেল দপদপিয়ে। যদিও এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। তবুও প্রেমের সমাধিতে কেরোসিন ঢালার ফল পরবর্তী জীবনে আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। মৃত আত্মার অভিশাপই বোধহয় তার কারণ। আমার জীবনে প্রেম-ভালোবাসা সবই তাই কেরোসিনে ভরা। সে জন্য অবশ্য আমি দুঃখ করি না। সব কিছুই দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছি।

(চলবে)

রবিবারের সাপ্লি
যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ২৯ এপ্রিল ২০১৮

গ্রন্থ সমালোচনা

অস্থির সময়ের জীবনকথা

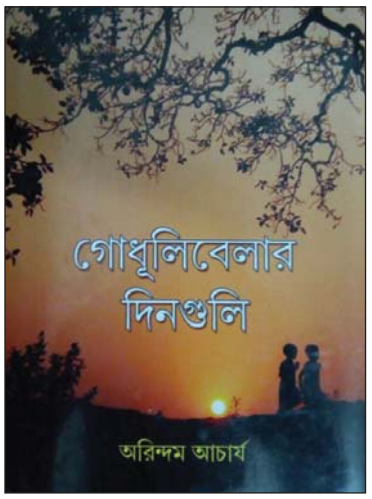

সোমনাথ আদক

অন্য অভিঘাতে লেখকের কলমে যখন ধরা দেয় ফেলে আসা সময়ের বিভিন্ন ঘটনার সাবলীল রেখাপাত, যোগ্য লেখনীশৈলিতে তা হয়ে ওঠে পাঠকের অত্যন্ত প্রিয়। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আশির দশক এমন একটা সময়, যখন বাংলা তথা কলকাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির যাপনচিত্র দেখেছে মানুষ। শহর কলকাতা এতদিন যেভাবে তার নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল পরিস্থিতির মারে পড়ে তা যেন বেশ অনেকটাই জৌলুসহীন হয়ে পড়ে এই সময়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই দলে দলে শরণার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকায় এই শহরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে, যা কি না চল্লিশের দশকের শেষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এতটা প্রকট হয়নি। এই পরিস্থিতি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে আরও বেশ কিছু বছর পরে, যখন প্রোমোটারি রাজ থাবা বসায় ও আকাশছোঁয়া নির্মাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। যদিও জলস্রোতের অভিমুখ বদলের কাজটা শুরু হয়েছিল আশির দশকেই। সেই সময়ের কলকাতা শহর, শহরতলি ও মফস্বলের প্রকৃতি, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও বিভিন্ন ঘটনাই হয়ে উঠেছে 'গোধূলিবেলার দিনগুলি'-র প্রেক্ষাপট। লেখক অরিন্দম আচার্য।

সেই সময় বেশ কিছু ভালো বই, গবেষণাধর্মী লেখা, নতুন সাংস্কৃতিক পত্র-পত্রিকা ও সিনেমা তৈরি হলেও কোনও কারণে তা যেন পূর্ণতা পাচ্ছিল না, বাধা পেতে শুরু করেছিল Collective development of Culture। তাই আশির দশকের সেই অস্থির পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক অরিন্দম আচার্য একদিকে যেমন রামকিঙ্কর বেজ, সমরেশ বসু, রাধারমণ মিত্র, খালেদ চৌধুরী, শক্তি-সুনীলের মতো চরিত্রকে এনেছেন; তেমনই জীতেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, অজিতেশ প্রমুখের মতো চরিত্রের অবতারণা করেছেন। আর লেখক এখানে বেশ কৌশলীভাবেই কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তার উপন্যাসের সব চরিত্রদের মধ্যে কথোপকথন, তাদের কার্যকলাপ ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে চরিত্র চিত্রণের কাজটি সেরে নিয়েছেন। 'গোধূলিবেলার দিনগুলি'-তে সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গ এলেও তাঁর সৃজনশীলতাকে প্রকাশ্যে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার দিকটাই লেখক এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, তবে একটু অন্যভাবে-বাহ্যিক পরিস্থিতির উপমা হিসাবে।

দীপ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত অরিন্দম আচার্য-র ২২৪ পাতার হার্ডবোর্ড বাইন্ডিং এই 'গোধূলিবেলার দিনগুলি' উপন্যাসটি পড়তে পড়তে পাঠককে যে বহু চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এ-কথা বলাই বাহুল্য। এখানে পাঠক যেমন প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও মমতা ঘেরা সম্পর্কের উত্থান-পতনের স্বাদ পাবেন। তেমনি আশির দশকের বামপন্থী রাজনীতি, শ্রমিক আন্দোলন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের নেগেটিভ প্রভাব বিস্তারের টুকরো টুকরো ছবিও দেখতে পাবেন। ফেলে আসা সময়ের প্রেক্ষিতে পাঠককে অন্য এক সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করাতে অনেকটাই সমর্থ এই বইটি।

● গোধূলিবেলার দিনগুলি | অরিন্দম আচার্য | দীপ প্রকাশন | দাম: ১৮০ টাকা

গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আপনার প্রকাশিত ২ কপি বই পাঠান এই ঠিকানায়:
যুগশঙ্খ সাপ্লি, ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com

সাপ্তাহিক রাশিফল

এই সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

২৯ এপ্রিল-৫ মে, ২০১৮

মেষ: ২৯ ও ৩০ তারিখে সপ্তম স্থানের চন্দ্র মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শান্তিদায়ক প্রমাণিত হবে। কোনও বিবাহ আয়োজনে ব্যস্ততা সপ্তাহের আদ্যভাগ থেকেই শুরু হয়ে যাবে। তবে ১-৩ মে মানে সপ্তাহের মধ্যভাগের সময়টা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কলহ, ব্যবসায় লোকসান, শরীর খারাপে আপনি জর্জরিত হয়ে পড়বেন। প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার দুঃখ আপনাকে পেতে হবে। তবে ৪ তারিখ থেকে পরিস্থিতি আবার আপনার অনুকূল হয়ে উঠবে। এইসময়ে বাড়ি সম্পর্কিত সমস্ত কাজ আপনি শেষ করে নিতে পারবেন।

বৃষ: বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা ২৯-৩০ তারিখের মধ্যে ব্যবসায় যেমন লাভ করবেন, তেমনি চাকরিজীবীদেরও মিলবে প্রোমোশনের সুযোগ। যাবতীয় বাধা-বিপত্তি সরে গিয়ে আর্থিক দিক থেকে আসবে নিরাপত্তা। তবে সপ্তাহের মধ্যভাগে সতর্ক থাকুন। বিশেষ করে ১-৩ মে-র মধ্যে। কোনও নিকটজনের কাছ থেকে ধোঁকা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রু ও বিরোধীপক্ষর সক্রিয়তা আপনাকে বিপাকে ফেলতে পারে। চিন্তায় শরীর খারাপ হওয়ার আশংকা। সপ্তাহের অন্তভাগে বিশেষত ৪ তারিখ থেকে আধ্যাত্মিকতার দিকে আপনার মন আকৃষ্ট হবে।

মিথুন: সপ্তাহের প্রথম দিনটি এড়িয়ে থাকুন যাবতীয় ভিড়ভাট্টা। ৩০ এপ্রিল থেকে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশস্ত হবে উন্নতির পথও। ১-২ মে তারিখে একটু সাবধানতা অবলম্বন করে চলুন। নাহলে শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। যদিও তাদের সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ৩-৪ তারিখের সময়টা ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ। ব্যবসা যাবতীয় লাভের মুখ দেখবে। ৫ তারিখ দিনটিতে সবদিক থেকেই মানসিক শান্তি পাবেন।

কর্কট: কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহের সূচনাটা যথেষ্ট শুভ। বিশেষ করে বলব, নতুন কোনও প্রেমজ সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার পক্ষে সময়টা আদর্শ। তবে এসময়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সবদিক ভালো করে ভাবনা-চিন্তা করে নেবেন, নাহলে পরে সমস্যা হতে পারে। দাম্পত্যশান্তি বজায় থাকবে। ১-২ মে-তে ব্যবসার কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। ৩-৪ তারিখে কর্মক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে তার সমাধান আপনি নিজেই করে নিতে পারবেন। নিজ বুদ্ধিবলে পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে ৫ মে থেকে মায়ের শরীর খারাপ আপনার চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে।

সিংহ: নতুন সপ্তাহের গোড়ার দিকে আপনি জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পড়াশোনায় মগ্ন থাকবেন। এসময়ে আচমকা প্রাপ্ত কোনও শুভ সংবাদে মনটা আনন্দে ভরে উঠবে। ১-২ মে তারিখের মধ্যে যাবতীয় সরকারি কাজে মিলবে সফলতা। ৩-৪ তারিখের মধ্যে এতদিনকার চলে আসা কোর্ট কেসের সমাধানে রায় আপনার পক্ষেই আসবে। বিরোধীপক্ষ নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে। ৫ তারিখ থেকে সময়টা আপনার জন্য লাভদায়ক।

কন্যা: সপ্তাহের শুরু থেকেই আপনি কমিয়ে আনবেন যাবতীয় ব্যয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্থিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি হবে না। এসময়ে পুরনো বন্ধুদের সান্নিধ্য আপনাকে আনন্দ দেবে। তবে সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে সময়টা আপনার জন্য শুভ। টাকা-পয়সা উপার্জন ভালোমতোই হবে। ব্যবসাতে নতুন পরিকল্পনা কার্যকর হবে। তবে ৪ ও ৫ মে তারিখে চন্দ্রের অবস্থানহেতু কেউ আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন। এইসময়ে ভুলেও কাউকে টাকা-পয়সা দেবেন না। চাকরিক্ষেত্রেও কোনও অচেনা ব্যক্তির উপর ভরসা করা উচিত হবে না।

তুলা: ২৯-৩০ এপ্রিল তারিখের মধ্যে তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকবে। এসময়ে কোনও অশুভ ঘটনায় মন হয়ে উঠবে ভরাক্রান্ত। তবে আদ্যভাগের শেষদিক থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। ১-৩ মে তারিখের মধ্যে চন্দ্র শুভ ফল প্রদান করবে। হাতে নেওয়া সমস্ত কাজেই আসবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। ৪-৫ মে তারিখের মধ্যে কোনও না কোনও উৎস থেকে হাতে অর্থ এসে যাবে। ডাকযোগে মানি অর্ডার, চেক বা ড্রাফট আসতে পারে। ধার দেওয়া অর্থও সপ্তাহের শেষভাগে হাতে এসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিক: ২৯-৩০ এপ্রিল দিনদুটি নানান কারণে মনমেজাজ খিঁচড়ে থাকবে। অবসাদ আপনাকে ঘিরে থাকবে, শরীরও খুব একটা ভালো থাকবে না। নেশা করা থেকে নিজেকে মানসিক জোরেই দূরে রাখতে হবে। ১-৩ মে তারিখের মধ্যে সময়টা আপনার অনুকূলে আসবে। ঘোরা-বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, আনন্দে সময়টা ভরে উঠবে। প্রেমজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। জমি কেনার যোগ রয়েছে। ৪-৫ তারিখের মধ্যে অসহায় ব্যক্তিরা নানাভাবে আপনার দ্বারা উপকৃত হবে।

ধনু: ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের সপ্তাহের আদ্যভাগে প্রচুর অর্থ হাতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়ির জন্য এসময়ে নতুন ফার্নিচার কেনার যোগ দেখা যায়। ১-৩ মে-র মধ্যে নানা কারণে আপনার মনটা চিন্তায় ভরে উঠবে। খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাজেট সামলাতে সমস্যা হয়ে যাবে। ৩ তারিখ দুপুরের পর থেকে ৫ তারিখের মধ্যে সময়টা শুভ প্রতীয়মান হয়। সব কাজেই মনের মতো ফল পাবেন। রাজনীতিবিদদের পক্ষে সময়টা শুভসূচক।

মকর: ২৯-৩০ এপ্রিলের মধ্যে জাতক-জাতিকাদের কোনও আইনি ঝামেলায় ফেঁসে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর্থিক মামলায় বিবাদের মোকাবিলা করতে হতে পারে। সপ্তাহের মধ্যভাগ মানে ১-৩ মে-র সময়টা অতীব শুভ। ধনপ্রাপ্তির পথে যাবতীয় বাধাবিঘ্ন দূর হবে। ব্যবসা ও চাকরিক্ষেত্রে কর্ম পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। চাকরিতে আপনার নিষ্ঠা ও সততার প্রশংসা হবে। তবে ৩-৫ তারিখ অর্থাৎ কি না সপ্তাহের অন্তভাগে কোথাও বিনিয়োগ করবেন না, করলে পরে সেই অর্থ হাতে আসার সম্ভাবনা কম।

কুম্ভ: কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের সপ্তাহের শুরু থেকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বন্ধুদের সঙ্গে কর্মোপলক্ষে বেশ কিছুটা ব্যস্ত সময় কাটাবেন। ১-২ তারিখের মধ্যে সমাজে আপনার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে অনেকাংশেই। সমাজকল্যাণমূলক কাজে মধ্যভাগের অনেকটা সময় ব্যয় যে হবে, তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ৩-৫ তারিখের মধ্যে একাধিক উপায়ে অর্থসমাগম হবে। কোনও জায়গা থেকে আটকে থাকা বা কাউকে ধার দেওয়া টাকা এসময়ে আপনি পেয়ে যাবেন।

মীন: ২৯ ও ৩০ এপ্রিল তারিখ দিনদুটি অবলম্বন করুন যাবতীয় সাবধানতা। নাহলে আচমকা আপনার রাগের জন্য কোনও অপ্রিয় ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে। তবে ১ তারিখ থেকে গ্রহ-নক্ষত্র ক্রমশ আপনার অনুকূলে আসবে। ২ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যাবে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে কাজগুলো শেষ করতে আপনাকে একটু পরিশ্রম ও সংঘর্ষ করতে হবে। ৩-৫ মে-র সময়টা ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ। উন্নতির আশা রয়েছে। বকেয়া টাকার অনেকটাই আদায় হয়ে যাবে।

দ্রোণাচার্য

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: **বিপ্লব রায়** | সাপ্লি টিম: তন্ময় মণ্ডল, শর্মিলা চন্দ্র, বিপাশা চক্রবর্তী, দোয়েল দত্ত
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯ • ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com • সাপ্লি সংক্রান্ত যোগাযোগ: ০৩৩ ৪০৬০৫৮৩৭